# স্বাধীনতার অভিযান
# যুগে যুগে

বামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল,

পরিবেশক
এণাক্ষী গ্রন্থ মন্দীর
১৫৯, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা ২৬

প্রকাশক

সুপ্রিয় সরকার

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

১৪, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

প্রিণ্টার :—এস, বি, বুবনা

ন্যাশন্যাল লিটারেচার প্রেস

১০৬, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# উৎসর্গ

ইতিহাসে যাহারা স্থান পাবে না, কিন্তু ইতিহাস যারা তৈরী করল আপনাদের হৃদয় শোণিতে, ভারতের সেই সব অজানা বীরদের উদ্দেশ্যে

গ্রন্থকার

এই লেখকের **পাপড়ি**

( ওপারের আলো ) মূল্য তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ—এণাক্ষী গ্রন্থমন্দির

পরলোক তত্ত্বে নবতম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। গ্রন্থকার আস্তিক কিংবা নাস্তিক নহেন, তিনি Agnostic। সৃষ্টির রহস্য তাঁহার মতে অজ্ঞেয়। তিনি এ পুস্তকে বলিয়াছেন

"আজ আমি দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই আলোচনা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে দেহমুক্ত অস্তিত্ব দেহ নিবদ্ধ অস্তিত্ব অপেক্ষা কম সত্য নহে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ বিষয়ে দর্শনকে সমর্থনই করিয়া থাকে"। "মৃত্যুর পর যে দেহ পড়িয়া থাকে বিজ্ঞান মতে তাহা তখনও অনুর সমষ্টি বা অচেতন অচঞ্চল বৈদ্যুতিক শক্তির সন্নিবেশ ( atomic combination of static energy ) কেবল যে চেতনাময় চঞ্চল শক্তি ( the psychic energy in its kinetic form ) জীবিত অবস্থায় সেই দেহের অন্তর্গত যন্ত্রপ্রণালীর ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিজ প্রয়োজনানুযায়ী সচল রাখিয়াছিল তাহা সে দেহ হইতে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং মৃত্যু সেই অনুসমষ্টি হইতে চেতনাময় চঞ্চল শক্তির নিস্ক্রমন ছাড়া আর কিছুই নয়।"

—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দর্শনের দৃষ্টি ভঙ্গীতে পর্য্যালোচনা করিয়া ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার বিচার করিয়াই গ্রন্থকার উপরোক্ত সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন—ইহাই পুস্তকের বিশেষত্ব। স্যার অলিভার লজের "রেমণ্ড" এর সহিত ইহার তুলনা করা চলে। "যাহারা পরলোক সম্বন্ধে উৎসুক তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন"-যুগান্তর।"

# ভূমিকা

যুগ যুগান্তের স্বাধীনতার অভিযান ঐতিহাসিক ভাবধারার দিক দিয়ে আলোচনা করাই এ বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, ইংরাজীতে যাকে বলে subjective treatment. ভাবধারার আলোচনা করতে গেলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুক্রমিক ও সম্পূর্ণ বিবৃতি দেওয়া সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় নয়, সেটা সাধারণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এ গ্রন্থে তাই সেটা কেউ আশা করবেন না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা সমগ্র সন্তোষজনক ইতিহাস আজও রচনা হয়নি। যে সব ঘটনাবলীর ভেতর দিয়ে দেশ আজ বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে তা সম্পূর্ণ জানবার ঔৎসুক্য খুবই স্বাভাবিক। তাই পরিশিষ্টে ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাবলীর একটা অনুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল। তার কিছুর বা উল্লেখ পাঠক এ বই এ পাবেন, কিছু পাবেন না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সে কাহিনী অনুসরণ করে তার সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বিবৃতি নানাস্থান হতে সংগ্রহ করতে পারবেন।

“স্বাধীনতা” কথাটা যদিও এক রয়েছে তবু কালের চক্রের ভেতর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটার অর্থের যে কতটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসের একটা মোটামুটি আলোচনা দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। অতীত ও বর্ত্তমানের নানাপ্রকার ভাব ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসে আজকের দিনে “স্বাধীনতা”র ভবিষ্যৎ রূপের পরিকল্পনার আভাসও একটু দেবার চেষ্টা করেছি। কতটা সাফল্য লাভ করেছি সেটা পাঠকের বিচার্য্য, তবে বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এতে ব্রতী হয়েছিলাম।

এ গ্রন্থ রচনা শেষ হয় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, কিন্তু ছাপাখানার ব্যবস্থা করতে জুন মাসের মাঝামাঝি এসে পড়ে। ততদিনে

ভারত পটভূমিকার একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটে, যা পূর্ব্বে কল্পনার বাইরে ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। তখন আর বই নতুন করে লেখা চলে না, আর তার প্রয়োজনও তেমন কিছু ছিল না, তাই সে পরিবর্ত্তনটা নির্দ্দেশ করতে ১০৩ পৃষ্ঠার শেষের ও ১০৪ পৃষ্ঠার প্রথম ভাগটা জুড়ে দেওয়া হয়। খানিকটা খাপছাড়া হলেও বইটা তাতে up-to-date হয়েছিল। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বই অক্টোবর মাসের আগে বের হল না। ইতিমধ্যে এল ১৫ই আগষ্ট, যেদিন খণ্ডিত ভারত ও পাকিস্থান ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হতে বিনা রক্তপাতেই স্বায়ত্বশাসন লাভ করল ব্রিটিশ-মহাজনপদ-নিচয়ের তুল্য মর্য্যাদায় ( Dominion Status )। খণ্ডিত ভারতের নতুন শাসন প্রণালী রচনাকার্য্যে গণপরিষদ আজও ব্যস্ত। তারা British Commonwealth of Nations এর ভেতরই থাকবে, না স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি। তবে শাসনভার গ্রহণ করবার পর হতেই সাম্প্রদায়িক কলহের জন্য কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যে রকম বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে ও স্থিতিবান স্বার্থ ( existing vested interests ) বজায় রাখতে তাদের যে প্রকার আগ্রহের আতিশয্য লক্ষ্যিত হচ্ছে, তাতে তাদের দ্বারা ভবিষ্যতে সত্যিকারের গণকল্যাণ কিছু সাধিত হতে পারবে কিনা এ বিষয়ে আজ সন্দেহ জেগেছে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই মনে। অবিশ্যি সে সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না, আর তার আলোচনা ভূমিকায় অশোভন। যদি কোন দিন এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে পারি, ও তত্দিনে ভারতের রাষ্ট্র পটভূমিকাও কিছুটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব, তখন এ সম্বন্ধে বিসদ আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

১৫৪ বি, রাসবিহারী এভিনিউ<br>২রা অক্টোবর, ১৯৪৭ } বামাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

# স্বাধীনতার অভিযান যুগে যুগে

[ স্বাধীনতা কী ? : অনধীনতা বনাম স্বাধীনতা : বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার অর্থ ]

"আমরা স্বাধীনতা চাই," "স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার" এ ধ্বনি আজকাল মুখে মুখে। স্বাধীনতায় যে প্রতি জাতির, প্রতি সমাজের, এমন কি প্রতি মানবের অধিকার আছে সে বিষয়ে এখন আর কেউ দ্বিরুক্তি করে না, যদিও অক্ষমতা, জগতের শান্তি বা নিরাপত্তা, মানবের বৃহত্তর স্বার্থ ইত্যাদি অনেক কিছুর দোহাই দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে একে প্রতিহত করবার চেষ্টা আজও চল্‌ছে।

কিন্তু স্বাধীনতা বল্‌তে আমরা কি বুঝি? কি সম্মোহন শক্তি আছে এই একটি কথার ভেতর যার প্রেরণা যুগে যুগে মানবকে এগিয়ে দিয়েছে অবহেলে নিজরক্ত বিসর্জ্জনে, যার উন্মাদনা একবার জাগ্‌লে আর কমে না, যা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে যুগের পর যুগ পড়ে ছড়িয়ে ও এক ধাপ অগ্রসর হলে পুনর্ব্বার তাকে ঠেলে নিয়ে যায় অন্য ধাপের গোড়ায়, যদিও আজ পর্য্যন্ত সে বুঝে উঠ্‌তে পারলনা যে এ চলার শেষ কোথায়। ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার জন্য আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত রক্তপাত হয়ে গেছে তা কি সবই হয়েছে সার্থক? দুইয়েরই উৎস অন্তরের প্রেরণা, বাইরের বাধা তাই তাদের নিরস্ত্র করতে পারেনি, পারবেও না কখন। কিন্তু মানুষের জীবনও কি মূল্যহীন?

স্বাধীনতা কি? কথাটি সন্ধি বিশ্লেষণে দাঁড়ায় স্ব—অধীনতা। অধীনতা বহির্ভূত কোন তাৎপর্য্য এর ভেতর নেই, তাই একে

অনধীনতার পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। পরের সুখ সুবিধা ও অধিকার বিবেচনা না করে নিজের খুসীমত কোন কাজ করা অনধীনতা হলেও তাকে স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। অনধীনতা ও স্বাধীনতা এক নয়, তবে স্বাধীনতায় অধীনতা শুধু "স্ব"র, অন্যের নয়, এটাই কথাটার বিশেষ তাৎপর্য্য। যে সময় মানুষ প্রকৃতির পরিবেষ্টনীতে একা একা থাকত ও যখন তার জীবন যাপনের জন্য অন্য কারুর ওপর নিভর করতে হত না, যখন পরস্পরের সংঘাত বড় একটা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না তখন স্বাধীনতার যা অর্থ ছিল বর্ত্তমান জগতে তা অচল। বর্ত্তমানে আমরা প্রত্যেকেই সমাজ বা রাষ্ট্রের অঙ্গ বিশেষ, এখন যাকে আমরা নিজের ইচ্ছা বলি তাও পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে গড়া।

সমাজ বা রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে মানুষ আদর্শ সুখী ছিল, না বর্ত্তমানে চারিদিকের বেষ্টনীর ভেতর সে পেয়েছে সত্যিকারের আনন্দের আস্বাদ একথা আলোচনা করতে গিয়ে দার্শনিকেরা মানবের আদি ইতিহাসের বিভিন্ন ছবি এঁকে গেছেন। রুসোর মতে তখনই ছিল মানব ইতিহাসের আদর্শ সময়, যখন নিজের পূর্ণতায় প্রত্যেক নরনারীই থাকত বিভোর হয়ে, যখন আইন কানুনের বেষ্টনীতে তাদের ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করবার কিছু ছিল না। আবার হব্‌সের মতে সেই সংস্থাহীন যুগ মানব ইতিহাসের অতি ভয়ঙ্কর কাল, তখন মানুষে মানুষে দেখা হলেই চলত রক্তারক্তি, ফলে তাদের জীবন যাত্রা হয়ে উঠেছিল নোংরা, পাশবিক ও স্বল্পকাল স্থায়ী। এর কোনটা যথার্থ ছবি তা বলা শক্ত। মানুষ অন্তরে সঙ্গ চায়, না সে নিভৃতে প্রকৃতির কোলে নিজকে বিলিয়ে দিতে চায় এও দার্শনিক গূঢ়তত্ত্ব, এর সমস্যাও অত্যন্ত কঠিন। হয়ত দুয়ের ভেতরই অনেকটা সত্য আছে নইলে

কর্ম্ম ও সাফল্যভরা জীবনের ফাঁকে অনেকেরই নির্জ্জনে সরে যাবার আকাঙ্খা হয় কেন ?

সমাজশূন্য, রাষ্ট্রশূন্য স্বাধীনতার রূপ হয়ত খুবই বাঞ্ছনীয় কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সে নয় তার আসল রূপ। বর্ত্তমানে আমাদের জীবন একটা জটিল পরিবেষ্টনীর ভেতর গড়ে উঠেছে, যাতে সমাজের, রাষ্ট্রের এমন কি বিশ্ব জগতের দাবীও অগ্রাহ্য করবার নয়। তাই স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আদর্শ, যার সংঘাতে আজ পর্য্যন্ত কত না যুদ্ধ, কত না রক্তপাত ঘটল, কিন্তু সত্যিকারের আদর্শের নাগাল আমরা পেলাম কি ? আমেরিকার গৃহযুদ্ধে যখন দক্ষিণের রাজ্যগুলি ইউনিয়নে আসবার বিপক্ষে যুদ্ধে মত্ত ছিল তখন তারা এই বলেই নিজেদের বুঝিয়েছে যে তারা স্বাধীনতার জন্য রক্তপাত করছে। ক্রীতদাস রাখবার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তারা মানতে প্রস্তুত ছিল না, ইউনিয়ন রাষ্ট্র তাদের কোন নির্দ্দেশ দেবে ও তাঁদের সেটা মানতে হবে এ ছিল তাদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের বিরোধী। আলষ্টার (Ulster) যে ইয়ারার (Eire) বাইরে থেকে গেল এর ভেতর ও সেই মনোভাব বর্ত্তমান। লেনিনকে ও অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন গড়্তে অনেক রক্তপাত করতে হয়েছে, আর আজ লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে ভারত-বর্ষকে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ করে ফেলবার যে দাবী, এও একটা স্বাধীনতার দাবী বলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল মনে করে থাকে। গত পচিশ বছরের ভেতর পৃথিবীর বুকের ওপর ঘটে গেল দু দুটো মহাসমর প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের থেকেও প্রচণ্ডতর বিভীষিকা ছড়িয়ে, প্রতিবারই প্রতিপক্ষ নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে বলে দেশের লোককে ক্ষেপিয়েছে ও সে ক্ষেপামিতে তারা অবহেলে বলি দিয়েছে

নিজেদের জীবন, যাতে তাদের বংশধরেরা স্বাধীনতা না হারিয়ে পৃথিবীতে জীবন কাটাতে পারে। হয়ত দুইদলের প্রত্যেকের কথার ভেতরই কিছুটা সত্য ছিল, নইলে নিছক মিথ্যা দিয়ে এক একটা জাতিকে এমন ভুলান সম্ভব হতে পারে না। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে সত্যিকারের সংঘাত আর কিছুরই নয়, সংঘাত আদর্শের। এখন কোন আদর্শ মানব জীবনে গ্রহণীয় আর কোনটা বর্জ্জনীয় সেটা বেছে নেওয়াই কঠিনতম সমস্যা। রুশিয়া হয়ত মনে করছে যে আর্থিক সাম্য সৃষ্টি হলেই মানব সমাজে স্বাধীনতা এসে পড়বে সুতরাং সে আর্থিক সাম্য ও শ্রেণীশূন্য সমাজ সৃষ্টি করতে কিছুদিন কড়াকড়ি এমন কি পেষণের ভেতর রাজ্যশাসন চললে ও শেষপর্য্যন্ত হয়ত শাসনের আবশ্যকতাই ফুরিয়ে যাবে, কারণ এক থেকে অন্যের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করবার চেষ্টাই সমাজে এত সংঘাতের সৃষ্টি করেছে, সে সংঘাতের কারণ না থাকলে কেউই কারু পথে বাধা সৃষ্টি করবে না, তখন প্রকৃতি প্রাকৃতিক স্বাধীনতার যে রূপ দিয়েছেন তা সমাজের ভেতর আর দশজনের সঙ্গেই উপভোগ করা সম্ভব হবে। আমেরিকা ও ইংলণ্ড হয়ত মনে করে যে নিজেদের দেশের জনসাধারণকে ভোট দেওয়ার অধিকার দিলেই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা হয়ে গেল কারণ তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হাতেই তো রয়ে গেল রাষ্ট্রচালনের পরিপূর্ণ অধিকার। তারা হয়ত এটা ও মনে করে যে তারা গণতন্ত্রে অন্যদের থেকে অনেক বেশী বিজ্ঞ ও সেই জন্য তাদের গণতন্ত্র অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার অজুহাতে তারা নিজেদের শাসন অন্যত্র ও নির্ব্বিবাদে চালিয়ে যেতে পারে, যতদিন পর্য্যন্ত না তাদের মতে সেই নিম্নস্তরের লোকেরা নিজ নিজ ভার বহন করতে উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এ ধাপ্পা আর বেশীদিন

চল্‌বে না। প্রেমের দায়ে পরের ভার বহন যে পক্ষান্তরে অন্যকে শোষণ, সেটা আজ বিশ্বসমাজে স্বীকৃত হয়ে গেছে। তর্কশাস্ত্রের নীতি দিয়ে আর তা চালান সম্ভব হচ্ছে না যদিও গায়ের জোরে হয়ত চল্‌বে সেটা এখনও আরো কিছুদিন।

কিন্তু পররাষ্ট্রের শাসন অপসৃত হলে বা আর্থিক সাম্য সংস্থাপিত হলেই সত্যি কি স্বাধীনতা জনসাধারণের লভ্য হয়ে পড়্‌বে? ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্টের ও রুশিয়ায় সারের (Tsar) রাজত্ব কালে সেখানে পর-রাষ্ট্রের কোন শাসন ছিল না, সপ্তদশ লুই (Louis XVI) এর রাজত্ব কালেও ফরাসী দেশ সে অর্থে স্বাধীনই ছিল, কিন্তু সেখানে কি সত্যিকারের কোন স্বাধীনতা ছিল? আর্থিক সাম্য স্বাধীনতা লাভের অনুকূল সন্দেহ নেই কিন্তু অর্থই কি একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি? অর্থ ছাড়াও অন্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের চেষ্টা মানুষের হওয়া সম্ভব ও তখনও তাদের ভেতর সংঘাত হবার খুবই সম্ভাবনা। সংঘাত হলেই তৃতীয় পক্ষের তুলাদণ্ডের প্রয়োজন, কিন্তু তৃতীয় নিরপেক্ষ লোকেরই যে এ পৃথিবীতে একান্ত অভাব। আর তৃতীয় নিরপেক্ষ লোকের বিচার মত চলার বাধ্যবাধকতা আর যাই হউক না কেন স্বাধীনতা ত হ'ল না, এটা অন্যের অধীনতা ছাড়া আর কিই বা? নিজেই যে সব সময় নিজের ভাল সব চেয়ে বেশী বুঝতে পারব, মানব ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় আজ আর তা বড় গলায় বলা চলে না। ক্রীতদাস প্রথা তুলে দেওয়ার সময় সব চেয়ে বড় প্রতিবাদ জানিয়েছিল ক্রীতদাসরা নিজেরাই। ফরাসী বিপ্লবে রাজার পক্ষ হয়ে লড়াই করবার দেশে লোকের অভাব হয়নি, আর তারা যে সবাই কেবল মাত্র পয়সার জন্য সে লড়াই লড়েছিল তাও নয়। রুশিয়ায় বল্‌শেভিক পার্টীকে শাসনভার নিয়ে যাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে

হয়েছিল তাদের ভেতর কৃষক ও মজুরের সংখ্যা কম ছিল না। জোর করে স্বাধীনতা দেওয়ার চেষ্টা না করলে, অনেক কিছুই যাকে আমরা স্বাধীনতার ধাপ বলি, তা বোধ হয় আমাদের নিজেদের ইচ্ছাক্রমেই আমাদের সামনে পড়ে থাকত।

স্বাধীনতার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা পৃথিবীতে আজ কিছু নতুন নয়, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন আকারে এ ইচ্ছা মানুষের মনের পরদায় দেখা দিয়েছে। সবাই যে সেটাকে একরকম করে বুঝেছে তা নয়, কিন্তু সবার ধারণার ভেতরই একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়, যদি আমরা তখনকার সমাজের ছবিটা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের সামনে নিয়ে আসি। প্রতিযুগেই মানুষ সামাজিক জীবনের ভেতর স্বাধীনতার সমস্যা মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছে, কতকটা হয়ত তারা পেরেছে কিন্তু বেশীর ভাগটাই পারেনি, তবে তারা সে চেষ্টা করে গেছে বলেই আজ সমস্যাটা এমন ব্যাপকভাবে আমাদের সাম্‌নে এসে পড়েছে। এ যুগ যদি তার অনেকটা সমাধান না করতে পারে তবে বলতে হবে যে জগতের বিবর্ত্তনের গতি প্রগতির দিকে নয়।

[ প্রাচীন যুগের স্বাধীনতার রূপ : প্রাচীন ভারত :
প্রাচীন গ্রীস্ : প্রাচীন রোম ]

প্রাচীন যুগে স্বাধীনতার কি রূপ ছিল ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমস্যা তখন কি ভাবে মেটান হত তা আলোচনা করতে গেলে সবার আগে আমাদের মনে আসে প্রাচীন ভারতের কথা। আমরা ভারতবাসী

বলেই যে বলছি তা নয়, বস্তুত সভ্যতাব এত উচ্চস্তরে আজ পর্য্যন্ত কেউ উঠ্‌তে পাবেনি, ওঠবাব কল্পনা পর্য্যন্ত কবেনি। তা ছাড়া সময়েব দিক দিযে দেখতে গেলেও সে সভ্যতাব কাল সকলেব আগে অবিশ্যি তাতে আমাদের গর্ব্ব করবার কিছু নেই, তাঁরা ও আমরা এক নই, আর যদি তাঁদেব সঙ্গে কোন সম্পর্ক ও আমাদের থেকে থাকে, তবে এটা ভেবে আমাদের লজ্জিতই হওয়া উচিত যে তাদের রক্ত আমাদের ধমনীতে বওয়া সত্বেও আজ আমাদের এ অধোগতি।

বহু শতাব্দী ধরে নানাপ্রকার চেষ্টা ও গবেষণা করে আজ সভ্য জগৎ বুঝেছে, যে স্বাধীনতা, নিজের বিবেক অনুযায়ী যা করা কর্ত্তব্য তাই নির্ব্বিবাদে ও নির্বাধায় করতে পাবাব অধিকার ও সুবিধা ছাড়া আব কিছুই নয়। স্বাধীনতা ভোগ কববাবও যোগ্যতা জন্মান দরকার ও সে যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হলে আমাদের শিক্ষিত, উন্নত ও স্বচ্ছ বিবেক পরিপূর্ণ হতে হবে, নইলে একান্ত বুদ্ধিহীন ও অলস কেউ যদি মনে করে যে সে কখনও বিদ্যার্জ্জন কববে না বা কোন কাজকর্ম্ম করে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করবে না, রোগের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চল্‌বে না, তার নিজের জীবন সে অবহেলে নষ্ট ও পীড়ণ করবে, সেটা কেউ আজ আর স্বাধীনতা বলে মেনে নেবে না ও তাতে সমাজ বা রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে সেটাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেও কেউ মনে কববে না। আজ তাই আইনকে কেউ স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করে না, বরঞ্চ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করাই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করে। যে সব আইন তা না করে, যে সব আইন সমাজের এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে যাতে যে কোন ব্যক্তি তার বিবেক অনুযায়ী কর্ত্তব্য করতে বাধা পায়, সে আইনের ধর্ম্মগত কোন ভিত্তি

নেই ও বর্ত্তমান রাজনীতিবিদ্ দার্শনিকদের মতে শুধু সে আইন অমান্য করবার অধিকারই যে আমাদের আছে তা নয়, সে আইন অমান্য করা আমাদের অন্যতম কর্ত্তব্য।

নির্ব্বিবাদে ও নির্বাধায় বিবেকানুযায়ী কর্ত্তব্য করবার অধিকারই যদি বস্তুতঃ স্বাধীনতা হয়ে থাকে তবে সেটা প্রাচীন ভারতে ব্যক্তি বিশেষের যে ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, অবিশ্যি সে স্বাধীনতা ছিল প্রধানতঃ বর্ণের গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ। প্রাচীন ভারতের সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা আমরা সকলেই জানি। প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন ধর্ম্ম ছিল, ও ব্যক্তি মাত্রেরই তাদের বর্ণানুযায়ী কাজ করে যাওয়াই তখন সকলে মনে করত জীবনের সার্থকতা। এক বর্ণের লোকের তখন অন্য বর্ণে উন্নীত হওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা জানা নেই তবে কিংবদন্তী আছে যে স্বকীয় সাধনার বলে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পেরেছিলেন। এই ব্রাহ্মণত্ব লাভে অর্থসম্পদ লাভ কিছু ছিল না, বরঞ্চ ক্ষত্রিয় হিসাবে তাঁর যা কিছু অর্থসম্পদ ছিল সবই তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল, পরিবর্ত্তে তিনি পেয়েছিলেন সম্মান। শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণদের পৃথিবীর সকল সম্পদ ও ক্ষমতা ত্যাগ করে দারিদ্র্যই করতে হত বরণ, তাঁদের কাজ ছিল শিক্ষা লাভ ও অপরকে সে শিক্ষা দান। বেদে ছিল একমাত্র তাঁদেরই অধিকার ও শ্রুতি স্মৃতির বিধি নিষেধের বিধান একমাত্র তাঁরাই দিতেন রাজাকে নির্দ্দেশ হিসাবে ও অশেষ ধন ও ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষত্রিয় নৃপতি তা মেনে নিত নতমস্তকে। বর্ত্তমান যুগে আইন কানুন বলতে যা বোঝায় তখনকার দিনে তা কিছু ছিল না, ছিল ব্রাহ্মণের স্মৃতিতে শ্রুতি স্মৃতির অশেষ বিধান যা রাখত তখনকার সমাজকে সঞ্জীবিত করে। নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী স্বধর্ম্ম পালনে কোন বাধা

ছিল না ও কেউ বাধা দিলে রাষ্ট্র তা কখনই সহ্য করত না। নিজেদের ভেতর কোন বিবাদ ও বিসম্বাদ হলে গণপঞ্চায়েৎরাই তা আপোস বা বিচার করে দিত, রাজার কাছে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হত না। বিকেন্দ্রীয় ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা তখন খুবই সুষ্ঠুভাবেই চলেছে, সংঘ, সমূহ, সভা প্রভৃতি নানারূপ প্রতিষ্ঠান তখন নিজেদের ভেতর বিবাদ, বিসম্বাদ মিটিয়েছে ও তাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সাহায্য করে গেছে। নীতিসূত্রে পাই যে রাজার প্রধান কর্ত্তব্য প্রজার মঙ্গল সাধন, দেশরক্ষা, সেনাগঠন ও ধর্ম্মরক্ষা। ধর্ম্মরক্ষা কথাটা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যা বোঝায় তখন ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হত না। প্রজারা যাতে নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী কর্ত্তব্য করে নিজের সিদ্ধিলাভ করতে পারে ও অপরকে এবিষয়ে কোন বাধা না দেয় এ দেখা রাজার কর্ত্তব্য ছিল। এরই নাম ছিল ধর্ম্মরক্ষা। অবিশ্যি রাজাকে তখন লোকে যে ঈশ্বরের প্রতীক বলে মনে করত না তা নয় কিন্তু তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হলে প্রজার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এমন কি তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার ভেতর ধর্ম্মতঃ কোন অন্যায় ছিল না। মহাভারতের অনুশাসন অনুসারে যে রাজা প্রজাকে পীড়ন করে তাকে প্রজারা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে এরূপ কথাও আছে। ব্যক্তিগত ভাবে কোন রাজপুরুষ ভগবানের অংশ, বা রাজা যা করেন তাই আইন, রাজার বিচার প্রজা করতে পারে না, এরূপ কোন কথা তখনকার সমাজে স্থান পায় নি। তদুপরি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও সামাজিক পদমর্য্যাদায় রাজার উচ্চবর্ণে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও একমাত্র বিদ্যার গৌরবেই অনেক অধিক সম্মান লাভ করে এসেছেন ও রাষ্ট্রের ভেতর একটা প্রচণ্ড শক্তি হিসাবেই বাস করতেন।

প্রাচীন হিন্দু সমাজের পর স্বাধীনতার কথাটা প্রথমে উঠেছিল গ্রীক্ সভ্যতায় এথেন্স রাজ্যে। মিশরে এরূপ কোন কথাই কেউ তেমন

ভাবে শোনেনি, তাদের ফারাও ( Pharoah ) ছিলেন স্বয়ং ভগবানের অংশ ও তাঁরই খুসী খেয়াল মত চলত রাজ্যশাসন। গ্রীসে এথেন্সই ছিল সব চেয়ে উন্নত রাজ্য। তখনকার রাজ্য অবিশ্যি এখনকার থেকে অনেক বিভিন্ন, কারণ রাজ্যের সীমা ছিল তখন এক একটি নগর ও নাগরিক ছিল হাজার খানেক। অবিশ্যি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অন্য লোকও সাময়িক ভাবে যে সেখানে থাকত না তা নয়, তবে রাষ্ট্রের নাগরিক ভাবে তাদের ধরা হত না ও নাগরিকের সুখ সুবিধা ও অধিকার ও তাদের দেওয়া হত না। এ ছাড়া ছিল একদল রাষ্ট্র অধিকারহীন ক্রীতদাস, যাদের অবস্থা ছিল গৃহপালিত পশু বা আসবাবের সামিল।

এথেন্স সমৃদ্ধিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের হাতে অধিকতর ক্রীতদাস, গরু, ভেড়া ইত্যাদি অনেক পশু ও অনেক উর্ব্বরা জমি এসে পড়ে। এর ভেতর কেউ কেউ নেতৃত্ব গ্রহণ করে অনুচর সংগ্রহ করতেন ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজা হয়ে বসতেন। রাজার হাতেই অবিশ্যি ছিল বিচার ভার ও সে বিচার তিনি করতেন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ত্তব্য বুদ্ধি দিয়ে। কেউ কেউ হয়ত ভাল ভাবেই রাজত্ব করে নাম কিনে গেছেন ও সুবিচার করবার ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন আবার কেউ কেউ প্রজাকে যথেষ্ট উৎপীড়ন করে নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা করে নিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত এথেন্সবাসীরা তাদের শাসনের জন্য একটা ধরাবাঁধা আইন লিপিবদ্ধ করা হউক এরূপ একটা দাবী করায় ড্রেকো নামক একজন আইনজ্ঞ আইন প্রণয়ন করে সেটা বাজারে হাটে প্রস্তর ফলকে খোদাই করে লিখে দিলেন সকলকে জানাবার জন্য। সে আইন নির্ম্মম বলে কেউ সেটা মানতে চাইল না, কারণ সামান্য চুরী অপরাধের দণ্ড ছিল মৃত্যু। শেষ পর্য্যন্ত সলোনকে তারা খুঁজে বের করে তাঁরই হাতে ভার দিল আইন প্রণয়নের। সলোন, সে কালের

সমাজ বিচার করে দেখলে, যে আইন প্রণয়ন করেছিলেন, তা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে খুবই মূল্যবান। তখনকার দিনে কেউ ধার শোধ করতে না পারলে তাকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা চল্‌ত। সলোনের আইনে নির্দ্দেশ ছিল যে কোন এথেন্সবাসীই ক্রীতদাস হতে বা থাকতে পারবে না, যারা পূর্ব্বে ক্রীতদাস হয়েছিল তাঁর আইন অনুযায়ী তারাও স্বাধীনতা লাভ করল। সলোন অনুশাসন দিলেন যে, কোন নাগরিকের কোন অভিযোগ থাকলে সে সেটা অন্য ত্রিশ জন নাগরিকের সভায় বিচারের জন্য আনতে পারবে। সব চেয়ে বড় অধিকার যা সলোন প্রণীত আইনে পাওয়া যায় ও যা বর্ত্তমান গণতন্ত্রের প্রথম বীজ বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না, তা হল এই যে প্রত্যেক নাগরিক এই আইন অনুসারে রাষ্ট্রশাসনে চক্রক্রমে অধিকার পাবে ও রাজপুরুষ জনগণই ভোটদ্বারা নির্ব্বাচন করবে। এটাকে এথেন্সবাসী গণশাসন ( Demos, Krato ) বলে অভিহিত করত, বস্তুতঃ এটাই বর্ত্তমানে গণতন্ত্রের ( Democracy ) মূল। রাজ্যশাসনে প্রত্যেকের অধিকার, ও যে আইন সবাইকে মানতে হবে সে আইন প্রণয়নে সকলের অল্পবিস্তর হাত থাকার ব্যবস্থা যে স্বাধীনতার একটা বড় অঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রত্যক্ষভাবে অধিকার দেওয়া বর্ত্তমান রাষ্ট্রে সম্ভব নয় কারণ এখন আর ১০০০টি নাগরিক নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত নয়, কেন্দ্রীভূত শাসনের ফলে লক্ষাধিক লোকের মুখপাত্র হয়ে একজনকে আইন সভায় আসতে হয় ও সে ব্যক্তি হয়ত তারমধ্যে ৮০,০০০ লোকের ও তাদের ইচ্ছার কোন সংবাদই রাখে না। গণতন্ত্র বর্ত্তমানে রাজনৈতিক দলের তন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যিকারের গণের অস্তিত্ব তার ভেতর খুব বেশী নাই।

গ্রীসের পর রোম সভ্যতা ভাবরাজ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশেষ কিছু দান করে যেতে পারেনি। যদিও রোম রাজ্য রিপাবলিকই ছিল

ও সেখানে গণসভা ( Plebian Assembly ) ও একটা ছিল, কিন্তু বস্তুতঃ রাজ্যশাসনের ক্ষমতা অল্পস খ্যাক অভিজাত শ্রেণীর লোকের হাতে থাকায় জনগণের ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বাধীনতা সাম্রাজ্যের অন্যান্য দাবীর নীচে চাপা পড়ে যায়। রোম তার সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধি সম্প্রসারণ কাজে ব্যস্ত থাকায় সৈন্য সামন্ত, যুদ্ধ বিগ্রহ সেখানে জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ হয়ে পড়ে, এমন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তেমন ভাবে রূপ পেতে কখনই অবকাশ পায় না, রোমেও তার অন্যথা হয়নি।

[ অন্ধকার যুগের পর ইউরোপের সভ্যতার সংস্কার ' ম্যাগনা কারটা সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের গৃহ যুদ্ধ : আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও যুক্তরাষ্ট্র গঠন ]

খৃষ্ট-জন্মের পাঁচশ বছর পরে রোম সাম্রাজ্যের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে অরাজকতা, লুণ্ঠন, ধর্ম্মে ধর্ম্মে কাটাকাটি আরম্ভ হওয়াতে তখন আর রাষ্ট্রজগতে স্বাধীনতার কোন কথাই উঠ্‌তে পারেনি। সে ছিল ইউরোপের একটা অন্ধকারময় যুগ। গ্রীস ও রোম সভ্যতা যা কিছু ইউরোপকে দিয়ে গেছিল তা সবই বিলোপ পেয়ে যেত যদি না পঞ্চদশ শতাব্দীতে চলত আবার সভ্যতা পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। ১৪৩৮সালে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে যা কিছু শিক্ষা গ্রীস্ ও রোম সভ্যতা হিসাবে জগৎকে দিয়ে গেছিল তা অধ্যয়ন ও সম্প্রসারণের অনেক সুবিধা ও সুযোগ হয়ে ওঠে। এই সময়ের ভেতর ভাবরাজ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বড় একটা ওঠবার অবকাশ পায়নি। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে

ভল্‌টেয়ার ও রুসোর লেখা যখন নিপীড়িত ফরাসী জাতির রুদ্ধ নিশ্বাসে আগুণ ধরিয়ে দিয়েছিল, তার পূর্ব্বে স্বাধীনতার কথাটা, বিশেষ করে শাসকের পেষণ ও অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণমতের জাগরণ বা জনগণের নিজ রাজ্য শাসনে কথা বলবার ন্যায্য অধিকার ইউরোপের কারু মনে তেমন করে সাড়া দেয়নি। যদি ও ১২১৫ সালে ইংলণ্ডে নৃপতি জন্ অভিজাত বংশীয় মুষ্টিমেয় উচ্চপদস্থ লোকের চাপে ম্যাগ্‌না কারটা ( Magna Carta ) সই করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু সে কাগজে এমন কিছু ছিলনা যাতে জনগণকে স্বাধীনতার দিক দিয়ে কিছু এগিয়ে দেয়। গ্রীসে সলোন যে আইন জনসাধারণকে দিয়ে ছিলেন তার তুলনায় এ হাস্যাস্পদ, তবুও প্রচার দ্বারা এটা মানব সমাজে একটা মস্ত কিছু ব্যাপার বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে ও আমরাও হয়ত অনেকে না ভেবেচিন্তে মনে করি যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলে ম্যাগ্‌না কারটা মস্ত বড় জিনিষ, যদিও সেটাতে আছে শুধু তখনকার দিনের আচার ও আইন লিপিবদ্ধ। আর একটা ঘটনা ও ইংলণ্ডের ইতিহাসে খুব বড় করে প্রচার করা হয়েছে স্বাধীনতার জয়স্তম্ভ হিসাবে, সেটা ১৬৪৯ সালে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নৃপতি প্রথম চার্লসের শিরচ্ছেদন। ক্রম্‌ওয়েল এ মন্ত্রের হোতা, কিন্তু কোন গণবাদের জন্য ক্রম্‌ওয়েল এতে নামেন নি বা রাজার প্রাণদণ্ডের পর ইংলণ্ডে কোন গণতন্ত্র স্থাপন করতে ও তিনি চেষ্টা করেন নি। সত্যি কথা বলতে গেলে রাজার দল ও অভিজাত বংশের দলের ভেতর পরস্পর বিতণ্ডার ফলেই চার্লসের প্রাণ হারাতে হয়, এ গৃহযুদ্ধে গণস্বাধীনতার কোন আদর্শ বর্ত্তমান ছিল না। বস্তুতঃ তাঁর স্ত্রী মেরিয়ার রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমতই প্রধানতঃ চার্লসের দুর্গতির কারণ। অবিশ্যি এ গৃহযুদ্ধে রাজার বিরুদ্ধ দল সমর্থন করতে গিয়ে কবি মিল্‌টন্ গদ্যরচনায় স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বপক্ষে যে সুপারিশ

করে গেছেন ইংরাজি সাহিত্যে তা চিরদিনই একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। এরিওপেজিটিকা ( Areopagitica ) ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার খুব বড় সুপারিশ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সে একটা অঙ্গ মাত্র। সে যাই হউক না কেন প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ডে ইংলণ্ডে কোন স্বাধীনতা হয় নি, কারণ সেটা স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল না। সে ছিল দুইটি পরাক্রান্ত দলের ভিতর গৃহবিবাদ।

স্বাধীনতার ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৭৮৮ সালে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের অধিনায়কত্বে স্বাধীন গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র সংগঠন একটি স্মরণীয় ঘটনা। নতুন মহাদেশ আবিষ্কার ও ইউরোপীয় জাতির উপনিবেশ ও স্ব স্ব রাজ্য বিস্তারের জন্য পরস্পরের ভেতর যুদ্ধবিগ্রহ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, ইতিহাসে সামান্য যাদের জ্ঞান আছে তাঁরাই জানেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড মোটামুটি অন্যান্য জায়গার সঙ্গে ক্যানাডা ও আমিরিকায় তার রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই উপনিবেশের ফলে ইউরোপের নানা জাতির লোক সেখানে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে ও সেখানেই তাদের ঘর বাড়ী বেধে থেকে যায়। ইংলণ্ডের রাজনীতির ফলে সেখানকার সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য একমাত্র ইংরাজ জাতির হাতেই এসে পড়ে। ইংলণ্ডের জিনিষ ছাড়া অন্য কিছু সেখানকার অধিবাসীরা কিনতে পেত না, ও সেখানকার উপজাত সমস্ত রপ্তানীই ইংলণ্ড হয়ে অন্যত্র যেতে হত, যার ফলে লাভালাভের বড় অংশ সেখানকার লোকদের না হয়ে হত ইংলণ্ডের, যদিও সে সব ব্যবসা বাণিজ্যে ইংলণ্ডের কোন শ্রম বা অন্য কিছু দান ছিল না। এটাকে আমেরিকাবাসীরা ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য শোষণ ছাড়া অন্য কিছু বলে

মেনে নিতে পারে নি। এর ওপর এল ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক কর আদায় করবার জুলুম। ফলে তাদের অভিযোগ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। তাদের তীব্র প্রতিবাদ এল দুই সূত্র থেকে। প্রথম এই যে কোন রাষ্ট্রেরই কর আদায় করবার ক্ষমতা নেই, যদি না সে রাষ্ট্রে করদাতাগণের প্রতিনিধি বর্তমান না থাকে, আর দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত জীবন যাপন ও ব্যবসা বাণিজ্য চালানর ওপর হস্তক্ষেপ রাষ্ট্র অধিকার বহির্ভূত। বলাবাহুল্য ফরাসী দার্শনিক ভল্‌টেয়ার ও রুসোর লেখা থেকে তারা এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা পায়। ইংলণ্ডের দার্শনিক লকের ( Locke ) লেখা থেকেও যে তারা সে বিদ্রোহের প্রেরণা পেয়েছিল তা নিঃসন্দেহ। আমেরিকাতেও অবিশ্যি স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক লেখক দাঁড়িয়ে গেছিল। প্যাট্রীক হেন্‌রী ও জেমস্ ওটিস্ খুব জোর গলায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সর্ব্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের প্রতিবাদ ছিল যে ভগবান্ প্রত্যেক মানুষকে সমান করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ও কেউ কারুর থেকে বড় বা ছোট নয়, রাজা জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্ট, জনগণ রাজার জন্য নয়, কোন রাষ্ট্রই তার অধিবাসীর সঙ্গে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করতে পারে না, আর কোন শাসকমণ্ডলীরও নিজের ইচ্ছা ও খুসী মত রাজ্য শাসন করবার ন্যায়তঃ কোন অধিকার নাই। ফলে ১৭৭৬ সালে ইংলণ্ডের কর আদায়ে বাধা দেবার জন্য তারা একটি সংঘ গড়ে তোলে। সে সংঘ ১৭৮৩ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে ও নিজেদের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বলে প্রচার করে। যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডকে পরাভব স্বীকার করতে হয় ও ১৭৮৮ সালে সে যুদ্ধের নায়ক জর্জ্জ ওয়াশিংটনের অধিনায়কত্বে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠন হয়। সেই রাষ্ট্র সংগঠনে কতক গুলি ঘোষণা আছে যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিবর্ত্তনের ইতিহাসে মূল্যবান

সম্পদ। ঘোষণায় বলা হয় যে প্রত্যেক নরনারীই স্বাধীন, শাসক সম্প্রদায় জনগণের প্রতিভূ ( trustee ) ও বেতন ভোগী কর্ম্মচারী মাত্র, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্ম পালন করবার পূর্ণ অধিকার আছে, তাতে রাষ্ট্রের কোন কথা বলবার নেই। স্বাধীনতা অভিযানে ভাবরাজ্যে এর মূল্য যে খুবই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজ অবিশ্যি স্বাধীনতার নামে যুক্তরাষ্ট্রে ধনিক দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ অনেক ক্ষেত্রেই চল্‌ছে, হয়ত ইংলণ্ডের যে শোষণ নীতির বিরুদ্ধে তারা সে দিন সংগ্রাম করেছিল সে নীতিই পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ্যহীন জাতির উপর তারাই নির্ব্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছে, হয়ত কৃষ্ণকায় নিগ্রোকে তারা কখনও সাম্যনীতি দিয়ে নিজেদের সমান করে দেখে না, অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা অনুযায়ী তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও করে থাকে রাষ্ট্রের পরোক্ষ সহায়তা নিয়েই, কিন্তু ভাবরাজ্যে সেদিন সেই সাম্য ও স্বাধীনতার সত্যতা স্বীকৃত না হলে হয়ত উনবিংশ শতাব্দীতে গৃহযুদ্ধের ফলে সেখান থেকে ক্রীতদাস প্রথা উঠে যেত না, হয়ত আজ ও সেখানে ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে হতভাগ্য অনেক নরনারীকে দাসত্ব স্বীকার করে তাদের প্রভুর আসবার পত্র বা গরু ভেড়ার সামিল হয়ে থাকতে হত। স্বাধীনতার অভিযানে পৃথিবীর এক একটা ঘটনা অফুরন্ত সোপান শ্রেণীর এক একটা ধাপ মাত্র, সেই ধাপ পেরিয়ে যদি আমরা বসে থাকি, আর না এগুই, তবে পেছনের টানে আমাদের গতি অনেক সময় নিস্ফল করে দিতে চায়। আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের দান যদি পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করে মানব সমাজ আর ও এগিয়ে যেত তবে প্রতিক্রিয়া আজ হয়ত এমনি ভাবে দেখা দিত না। রুশিয়ার বিপ্লবের অগ্রগতি যদি সমান অপ্রতিহত গতিতে চল্‌ত তবে আজ আর ত্রিশ বছর পরে ও পৃথিবীর অন্যজাতি সে সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকত না।

কিন্তু তা হবার নয়, পিছনের টান ত প্রকৃতির স্বভাবধর্ম্ম, আর সে পিছনের টানই রুশিয়াকে সাবধান করে দিয়েছে, তাই তারা বিশ্বকে ঠেলে রেখে নিজেদের দেশকে বাচিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে, অনেক সময় হয়ত অন্যান্য দেশের জনগণের অকল্যাণ করেও।

[ ফরাসী বিপ্লব : সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ : স্বাতন্ত্র্যবাদ ও তার প্রভাব : সমষ্টিবাদের উৎপত্তি : অরাষ্ট্রবাদের যুক্তি ]

ভল্‌টেয়ার ও রুসোর শিক্ষাই ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার কথা। তখনকার দিনে সবাই বিশ্বাস করত যে রাজা ভগবানের প্রতীক্‌ ও রাজা যা করেন তা ভগবানেরই কাজ ও সেটাকে অবনত মস্তকে পালন করাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের চলতি বিশ্বাসের ওপর ভলটেয়ারই করেন প্রথম আঘাত ও রুসো জাগিয়ে দেন জনগণের চেতনা যাতে করে তারা বুঝতে পারে যে তাদের দুর্দ্দশার জন্য দায়ী তাদের রাজা ও শাসক সম্প্রদায়। রুসোর মতে এ জগতে সবারই স্বাধীন ও সুখী না হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সবাই জন্মেছে স্বাধীন হয়ে, কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে আজ তারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ( Man is born free but he is found everywhere in chains )। পুরোহিত, রাজা, ব্যবহারজীবী এদের সম্মিলিত চক্রান্তের ফলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে জীবন যাপন করছে ভারবাহী বলিবর্দ্দের মত। জনমতই ( General Will ) সর্ব্বশক্তিমান, তারই নির্দ্দেশক্রমে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রশাসন হওয়া উচিত। শাসক সম্প্রদায় জনমতের ভৃত্য

বই আর কিছুই নয়, শাসন পরিচালনা করতে গিয়ে যারা সে জনমত উপেক্ষা করে তারা প্রবঞ্চক ও তাদের প্রবঞ্চনার জন্য প্রাণদণ্ডই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। তখনকার দিনে ফ্রান্সে জনসাধারণের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল তা সবারই জানা আছে। জনগণের এ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী ছিল নৃপতি ও তাঁর অনুগৃহীত শাসকমণ্ডলীর শোষণ নীতি। এ শোচনীয় অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায় ষষ্ঠদশ লুই এর রাজত্বকালে। ষষ্ঠদশ লুই ( Louis XVI ) ছিলেন একান্ত বুদ্ধিহীন রাজা ও তাকে চালিত করত তাঁর পত্নী মারী আন্‌তোয়ানেত ( Marie Antionette ) বিলাস ও স্বার্থপরতা ছাড়া যার অন্য কোন চিন্তা ছিলনা। রাজকর তখন অভিজাত বংশের লোকদের দিতে হত না, দিতে হত জনসাধারণকে তাদের দুমুঠো অন্নের ভাগ থেকে। রাজকোষে অর্থের অভাব হওয়ায় করের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চল্‌ল ও তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শেষ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের ( National Assembly ) নেতৃত্বে ১৭৮৯ সালের মাঝামাঝি ফ্রান্সে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল।

ফ্রান্সে বিদ্রোহ দুইটি, প্রথমটি ১৭৯১ সালে থেমে যায় ও তার ফলে দাসত্ব, শ্রেণীগত সুখ সুবিধা, উপাধি ও শ্রেণী বিচারে স্বতন্ত্র বিচারালয় সমস্তই বিলুপ্তি পায়। বিদ্রোহীরা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে সিদ্ধান্ত করে যে তারা দেশে দায়িত্ব-পূর্ণ নৃপতি-শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু বিদেশী রাজ্যসমূহের হস্তক্ষেপের জন্য বিদ্রোহ নতুন আকার ধরতে বাধ্য হল। প্রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার নৃপতিরা দাবী করলেন যে পূর্ব্ব অবস্থামত ষষ্ঠদশ লুইকে পুনরায় সিংহাসনে বসাতে হবে। এর ফলে জেকোবিন দলের জন-প্রিয়তা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায় ও তাদের নায়কত্বে দ্বিতীয় বারের বিদ্রোহ প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র বা রিপাব্‌লিক। এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারী। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ এদের করতে হয়েছে গৃহ

ও বহিঃ শত্রুর বিরুদ্ধে, কিন্তু স্বাধীনতার ধ্বজা তাতে ম্লান হয় নি, শেষ পর্য্যন্ত অন্যান্য রাজ্যের পরাজয়ের পর প্রাশিয়ানরাও ভাইমি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় বিপ্লব সবদিক দিয়েই জয়যুক্ত হয়। বিদেশী নৃপতিরা লুইকে দায়িত্ব শূন্য নৃপতি হিসাবে সিংহাসনে বসাতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ও রাণী আনতোয়ানেতের মৃত্যুর কারণ হলেন।

ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা ও সেটাই তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে রূপ দিতে প্রয়াস পায়। সেই ফরাসী বিপ্লবের ভাবরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। আজ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই সোভিয়েট রুশিয়া নিজ রাজ্যে সাম্য ও মৈত্রী সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প। রুশিয়ার বিপ্লবই ফরাসী বিপ্লবের পর স্বাধীনতার ইতিহাসে সব চেয়ে বড় ঘটনা।

রাষ্ট্র শক্তির ওপর এতদিন যে ভক্তি ও ভয় জনগণকে মূক ও নিশ্চল করে রেখেছিল ফরাসী বিপ্লব তা একেবারে শিথিল করে দেয়। ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা তাই নিয়ে তখন তর্ক ওঠে ও যে দুটি মতবাদ তখন জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তোলে তা উভয়েই ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সুপারিশ। দুইয়ের ভেতর অনেক কিছু তফাৎ থাকলেও রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযান উভয়ের ভেতরই ছিল, বস্তুতঃ এই অভিযানই স্বাতন্ত্র্যবাদ ( Individualism ) ও অরাষ্ট্রবাদের ( Anarchism ) মূল ভিত্তি। স্বাতন্ত্রবাদের মূল কথাটি হচ্ছে যে ব্যক্তিমাত্রই নিজেই তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও ভাল মন্দ সব চেয়ে বেশী বুঝতে পারে ও যতই তাকে এ বিষয়ে নিজের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে ততই তার এ সব লাভ করবার বেশী সুবিধা ও সম্ভাবনা জন্মাবে। রাষ্ট্র যদি সহায়তার নাম করে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তবে তাতে তার প্রেরণা ও চরিত্রের

বৈশিষ্ট নষ্ট হয়ে যাবে ও সেটা তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই হবে না। কে কি ধর্ম্মমত পোষণ করবে কার সঙ্গে সহযোগিতা করবে কতদুর পড়াশুনা করবে, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কি প্রকার কাজ, কি সঙ্গে করবে, কি রকম বাড়ী ঘরে বাস করবে, কি খাবে, কি পড়বে, এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর ভেতর বাইরের কারুর, বিশেষ করে রাষ্ট্রের কথা বলবার কোন যৌক্তিকতা নেই। রাষ্ট্রের কাজ শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, এর বাইরে কিছু করতে গেলে সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ বলেই ধরতে হবে। ঠিক সেই সময় চালর্স ডারউইনের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস বের হওয়াতে এ মতবাদের জোর আরও বেড়ে গেল। ডারউইনের মতে পরস্পরের প্রতিযোগিতা ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম্ম। প্রকৃতির শক্তির প্রভাবে জীবন সংগ্রামে যে যোগ্য সেই টিকে থাকবে, অযোগ্যদের পৃথিবীতে স্থান নেই, তাদের বিলুপ্তি করাই প্রকৃতির ধর্ম্ম ও এ বিলুপ্তির গতি বন্ধ করাও সম্ভব নয়। এ বিলুপ্তির গতিরোধ করে ঘটনাচক্রের পরিণতি কিছু কালের জন্য খানিকটা ঠেকিয়ে রাখা হয়ত সম্ভব কিন্তু সেটা নিরর্থক ও প্রকৃতি ধর্ম্ম বিরোধী। এই সব কারণে তখন স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতানুযায়ী প্রত্যেককে যার যার নিজের হাতে একান্তে ছেড়ে দেওয়ার মত খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। অ্যাডাম্ স্মিথ অর্থনীতির দিক দিয়ে এ স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার করে বল্লেন যে আর্থিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যত কম হস্তক্ষেপ করবে ও যতই ব্যক্তি বিশেষকে স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার অধিকার ও সুযোগ দেবে ততই তা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। এ স্বাতন্ত্র্যবাদ যাঁরা সমর্থন করে গেছেন তার মধ্যে বেন্থাম, মিল, টকোয়েভিলে ও হারবার্ট স্পেন্সারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরাসী দেশে ও বিশেষ করে ইংলণ্ডে এ মতবাদ খুবই কার্য্যকরী হয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ

শতাব্দীতে যন্ত্র ও শিল্প বিপ্লবের ( Mechanical and Industrial Revolutions ) ফলে ক্রমে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে এই যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, তা দুর্ব্বলের পক্ষে সবলের হাতে নির্ব্বিবাদে ও নির্বাধায় নিষ্পেষিত হওয়ার স্বাধীনতা বই আর কিছুই নয়। ধনিকরা তাদের অর্থবলে খুসীমত নির্ধন শ্রমিকদের সামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে যত ঘণ্টা ইচ্ছা খাটিয়ে নিতেন, রাষ্ট্রের তার ওপর বলবার কিছু ছিল না। কলকারখানার গুদামে ব্যবস্থা অভাবে স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল জঘন্য ও রাষ্ট্র সে সময় এ সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়ন করে কোন বিধান ও দিত না। শিশুদের যখন বিদ্যার্জ্জন করা উচিত তখন তারা নাম মাত্র পারিশ্রমিকে যেত ধনিকদের কারখানায় কাজ করতে। জনসাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব থেকেই বঞ্চিত হয়ে থাকত। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নৈতিক হিসাবে কিছু অন্যায় নয়, তবে যোগ্যতম কে? জীবন সংগ্রামে যারা টিঁকে যায় তারাই যোগ্যতম, আর একমাত্র যোগ্যতমের জীবন সংগ্রামে টিঁকে থাকা বাঞ্ছিত, এর দুয়ের ভেতর তর্ক শাস্ত্রের যুক্তির গলদ আছে। উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা কোন ক্রমে ধনের মালিক হয়েছে বলেই যে তারা যোগ্যতম, এ যুক্তি তর্ক শাস্ত্রের নীতি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। স্বাতন্ত্র্যবাদ কাজে লাগল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমষ্টিবাদের ( Collectivism ) আবেদন কোন রাষ্ট্রই একেবারে উপেক্ষা করতে পারল না, ও দুর্ব্বলকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হল অনেক কিছু আইন কানুনের ব্যবস্থা করবার। সমষ্টিবাদের প্রতিপত্তির আর ও একটা কারণ ছিল। ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কোপ্রাসিয়ান যুদ্ধে হল ফরাসীর নিদারুণ পরাজয়। তাতে সবার চোখ খুলে গেল, সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ছাড়া দেশের শক্তি বাড়ান যায় না, এ সম্বন্ধে তখন আর দু'মত রইল না। রাষ্ট্রের যে আইন প্রত্যেককে জীবনের প্রারম্ভে শিক্ষা পাওয়ার জন্য অবৈতনিক

বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য করে, শিশুদের কারখানায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করে দেয়, কতগুলি স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রত্যেককে পালতে বাধ্য করে, কারখানায় শ্রমিককে দৈনিক খাটাবার উচ্চতম সময় ধার্য্য করে দেয়, তাকে আর আজ কেউ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করবে না, আর এ আইনের জন্য জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারবে না, একথাও আর আজ কেউ বলবে না। স্বাধীনতার অভিযানে স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

সমষ্টিবাদ অবিশ্যি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করেছিল তথাকার অবস্থানুযায়ী। ইংলণ্ড, এ সমষ্টিবাদের ফলে, কতগুলি আইন প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হয়েছে, তা থেকে বেশী কিছু বিপর্য্যয় রক্ষণশীল ইংলণ্ড নিজদেশে ঘটতে দেয় নি। এ সমষ্টিবাদের যে তিনটি রূপ সারা ইউরোপকে তচ নচ করে দিয়েছে তা যথাক্রমে শ্রমিক সংঘবাদ ( Syndicalism ), ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীবাদ ( Fascism and National Socialism ) ও সমাজতন্ত্রবাদ ( Socialism or Communism )। শ্রমিক সংঘবাদ ফ্রান্সে অনেক দিন নিজকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রবাদের ভেতর তার পৃষ্ঠপোষকেরা মিলিয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালী ও জার্ম্মানীকে সমাজতন্ত্রবাদের থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য মুসোলিনি ও হিটলার ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীবাদের আশ্রয় নেয়। সেই পিলে চমকান ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীবাদ ও মন মাতানো মার্ক্সবাদ যে একই মূল থেকে নেওয়া ও তাদের ভেতর মিল অনেক কিছু আছে সে কথা শুনলে অনেকেই হয়ত অবিশ্বাসের বিজ্ঞ হাসি হাসবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীবাদ জগৎ থেকে একেবারে মুছে গেছে বলেই আশা করা যাচ্ছে, তাই এ নিয়ে আর আলোচনা

নিষ্প্রয়োজন। ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীবাদ দর্শন হিসাবে কখনই উচিৎ মূল্য পায় নি, তার প্রধান কারণ যে যখনই দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে এর আলোচনা করতে বসা গেছে তখনই মুসোলিনী ও হিট্‌লারের নিজ দেশের বিরুদ্ধবাদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও তাদের বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনার কথা মনে এসে আমাদের নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধিকে টলিয়ে দিয়েছে। এংলো আমেরিকান প্রচার ফলে আমরা নাৎসীবাদের বিভীষিকাই চিরকাল দেখে এসেছি, এমন কি ভাগ্যচক্রে এদের রুশিয়ার সঙ্গে হাত মেলাবার আগে রুশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে ও এমন একটা ভয়ঙ্কর ছবি নিয়ত তারা আমাদের সামনে ধরতে কসুর করেনি ও আমাদের মধ্যে অনেকে সেটা ভয়াবহ বলে বিশ্বাস ও করেছে। আজ অবিশ্যি দিন বদ্‌লে গেছে আজ প্রচার করে ও কেউ একথা বল্‌বে না যে মার্কসবাদ একাধাবে জাতি সমাজ ও ভগবান্ বিরোধী ( Anti-National, Anti-Social, and Anti-God ) আর রুশিয়ায নারীর সতীত্ব, ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম্মমত পোষণ, ভগবানের আরাধনা, সমস্তই অচল। কিন্তু মিতালি প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মুখে একথা আমাদের নিরন্তর শুন্‌তে হয়েছে। আজ প্রচার দিয়ে রুশিয়ার ছবি তেমন ভয়াবহ করে তোলা আর সম্ভব হবে না, তবে হিট্‌লার ও মুসোলিনীর ইহুদী উৎখাৎ ও এবিসিনিয়া ও চেকোশ্লোভেকিয়া গ্রাস ইত্যাদি নানা কার্য্য কলাপে ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী-বাদ দর্শন হিসাবে চিরকালই তার ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে।

যখন স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই সময় ও তারপর রুশিয়ায় ও খানিকটা জার্ম্মাণীতে অরাষ্ট্রবাদ জনগণকে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে একটা মস্ত বড়

অবলম্বন জুগিয়েছিল। অরাষ্ট্রবাদের যাঁরা নেতা ছিলেন ও জ্ঞান-জগতে আদর্শ হিসাবে এর প্রচলন করে গেছেন তাঁর ভেতর গড্উইন, প্রাউধন, ম্যাকস্‌ষ্টারনার, মোজেস্ হেস্, কার্ল গ্রুণ, বাকুনিন, টলষ্টয় ও সর্ব্বশেষে ক্রোপোটকিনের নাম কেউ ভুলবে না। রুশিয়ার বিপ্লবের জয় ক্রোপোট কিন্ দেখে গেছিলেন, সার ( Tsar ) রাজ্যের অবসান তার জীবনের যে লক্ষ্য ছিল তা সমাধান দেখে গেলেও সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় শাসন ও নির্ম্মম রাজদণ্ড তাঁকে জীবনের শেষ কটা দিন খুব বেশী শান্তি দিতে পারেনি তা নিঃসন্দেহ। ছোট ছোট বিকেন্দ্রীয় সমাজ ও সংঘ স্থাপনের ও রাষ্ট্রকে তুলে দেওয়ার জন্য যিনি ষাট বছর ধরে সুপারিশ করে এসেছেন তার চোখে রুশিয়ার বর্ত্তমান পরিস্থিতি খুব সুখকর হতে পারে না ও তিনি এ নির্ম্মম রাজ্যশাসন সমর্থন ও করতে পারেন নি, যদি ও রুশিয়ার বর্ত্তমান বলসেভিকেরা তাঁকে বিপ্লবের একজন প্রধান পুরোহিত বলেই সম্মান দেখিয়েছিলেন ও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাসগৃহ মিউজিয়াম রূপে রক্ষা করে যাচ্ছেন।

অরাষ্ট্রবাদীর মতে রাষ্ট্রশক্তির সৃষ্টি হয়েছিল মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য। পৃথিবীতে আজ যা কিছু ন্যায় ও অন্যায় দেখা যাচ্ছে ও মানুষকে যে সব কাজের জন্য আমাদের অপরাধী বলে মনে হয় তার ভেতর মানুষের মৌলিক বা প্রকৃতিগত কোন দোষ নেই, দোষ সমাজের ও রাষ্ট্রের, কারণ তারাই গায়ের জোরে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ রক্ষার জন্য কতগুলি বৈষম্য সৃষ্টি করে আজ তা রক্ষণে কৃত-সংকল্প ও সেই রক্ষণের জন্যই আইন, কানুন, বিধি, নিষেধ ইত্যাদির প্রবর্ত্তন, যা অমান্য করাই আমরা সাধারণতঃ অপরাধ বলে মনে করি। এ বিশাল জগতে সকলেরই সকল বিষয়ে অধিকার আছে, এর কিছুই কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সম্পত্তি আঁকড়ে থাকা চুরি ( Pro-

perty is theft)। উর্ব্বরা জমি তারই প্রাপ্য যে সেটা চাষ করে জগতের কল্যাণে ফসল ফলাতে পারে ও চায়, তার জন্য কোন কর চাইবার কারুর অধিকার নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপহরণ আমরা চুরি বলে থাকি ও তাকে একটা মস্ত বড় অপরাধ বলে মনে করি, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ হলে চুরির কোন মানেই থাকে না। এ ও দেখা যায় যে চোর ও ডাকাতদের ভেতর ও একটা মস্ত বড় ন্যায় ও ধর্ম্ম বুদ্ধি বর্ত্তমান ও তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি কায মনোবাক্যে রক্ষা করে চলে, কখনও কথার খেলাপ করে না, যদিও তাদের অপহৃত দ্রব্যের ভাগ বাঁটোয়ারা করবার সম্বন্ধে রাষ্ট্রের কোন আইন কানুন নেই। চোর ও ডাকাতের ভেতর নৈতিক আদর্শ রাষ্ট্রের হতে কিছু নিম্নতর নয়। কেউ হয়ত কাউকে আঘাত করত না এ পৃথিবীতে যদি একজনের স্বার্থের সঙ্গে অন্যের স্বার্থের কখনও না সংঘর্ষ বাধত। কেন্দ্রীভূত সমাজ, সম্পত্তির বিধান, বিবাহ বন্ধন ইত্যাদিই মানুষের পরস্পরের ভেতর বিরোধের কারণ। উচ্চশ্রেণীর সম্পদ, মর্য্যাদা ও সুবিধা বজায় রাখবার জন্যই রাষ্ট্রে আইন কানুনের পরিকল্পনা। এতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকে না, থাকা সম্ভব ও নয়। সম্পত্তি তুলে দাও, সমাজ ও সংঘ প্রত্যেককে নিজ ইচ্ছানুযায়ী গড়তে ও বেছে নিতে দাও, প্রথা, বিধি ও অসাম্য উচ্ছেদ করে ফেল, দেখবে যে রাষ্ট্রের ও তার প্রতিহারী শক্তির কোনই প্রয়োজন নেই, নিজের ভাল সবাই নিজেই বুঝবে ও সংঘাতের কারণ অবর্ত্তমানে পরস্পরের কোন সংঘাত ও বাধবে না, ও সেই বিবাদ বিসম্বাদ মেটাতে রাষ্ট্র শক্তির কোন প্রয়োজন ও হবে না। অরাষ্ট্রবাদের যুক্তির একমাত্র প্রতিবাদ হিসাবে বলা যায় যে পৃথিবীতে এমন লোক যদি জন্মায়, অত্যাচার বা খুন করা যার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তবে সমস্ত

অসাম্য, বিধি, প্রথা তুলে দিলেও তাকে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ব্যতিরিকে প্রতিরোধ করার কি উপায়? তবে জন্ম অপরাধী কেউ কোথায় আছে কিনা তাই সন্দেহ, যদিও অপরাধতত্ত্ব ( Criminiology ) তাদের অস্তিত্ব খুব জোর গলায়ই প্রচার করে এসেছে।

* * * * *

( ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতার অভিযান—আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও দাসত্ব উচ্ছেদ : মার্কসবাদের স্বরূপ • বিংশ শতাব্দীর রুশিয়া গণ-বিপ্লব )

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতার অভিযানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর চেষ্টায় অষ্ট্রিয়ার কবল হতে ইটালির মুক্তি ও নব ইটালির গঠন ও ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের পর যে অরলিয়েন্স নৃপতি শাসন গড়ে গঠেছিল তার উৎখাৎ ও গণতন্ত্র বা রিপাব্‌লিকের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে দক্ষিণের রাজ্যগুলির ভেতর দাসত্ব প্রথা উঠে যায় ও তখন থেকে জাতীয় সমাজে ক্রীতদাসত্ব নিষিদ্ধ হয়ে গেল যদিও অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক জাতির অন্য জাতির ক্রীতদাসত্ব আজ ও রয়ে গেছে।

সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব উভয়েরই আদর্শ ছিল, দুইই প্রচার করে গেছিল যে পৃথিবীতে সকল মানুষই এক, তাদের ভেতর মৌলিক কোন ভেদ নাই, সুতরাং কোন বৈষম্য থাকা ও নীতিসঙ্গত নয়। রাজ পুরুষ বা অভিজাত বংশের অস্তিত্ব নিঃশেষ তারা করে দিলেও শ্রেণীগত বৈষম্য না হতে পারে সমাজে এমন কোন ব্যবস্থা তারা করে যেতে পারেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্র ও শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থের বণ্টনে যখন ধনিক শ্রমিকের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের তল্পী বাড়িয়ে নিতে লাগল তখন এ দু শ্রেণীর ভেতর পার্থক্য পূর্ব্বের রাজপুরুষ ও নিপীড়িত গণ-সাধারণের থেকে কিছু কম হয়ে দাঁড়াল না। অর্থ সকল বিষয়ের মাপকাঠি হওয়ায় অর্থশালীরা শুধু বস্তু জগতের সুখ সুবিধার অধিকারী হল না, পরন্তু রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতাও অবলীলাক্রমে তাদের হাতে পড়ল। তাদেরই অঙ্গুলি সঙ্কেতে হতে লাগল রাষ্ট্রের পরিচালনা, যার ফলে ধনিকের স্বার্থে শ্রমিকের শোষণ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের একটা প্রকাণ্ড ব্যাধি হয়ে দাঁড়াল। মনীষী কার্ল মার্কসের চোখে এটা পড়ে। দার্শনিক ভাবে তিনি এটা পর্য্যালোচনা করে বলেন যে এর ফলে অর্থ ক্রমশই মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে নিবদ্ধ হওয়ায় শ্রমিকরা বঞ্চিত হতে হতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বহারার পর্য্যায়ে পৌঁছুবে ও যখন তারা দেখবে ও বুঝবে যে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করতে তারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও এর কিছুই উপভোগ করতে পারছেনা, বরঞ্চ তারাই করছে যারা সঞ্চিত অর্থের জোরে কায়িক কোন পরিশ্রম করে না, তখন শ্রমিকে শ্রমিকে ভেদাভেদ চলে গিয়ে সমষ্টির বিপ্লব ধনিকের বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী হবে ও তার ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য পৃথিবী থেকে উঠে যাবে, ও পরে যে সমাজ আসবে তা হবে কেবল একটি শ্রেণীর, ও সে শ্রেণী মানবজাতির। মার্কস অবিশ্যি ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় কোন বিদ্রোহে সহানুভূতি প্রকাশ করেননি, বরঞ্চ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে শ্রমিকের মানসিক বিপ্লবের ফলেই সমাজে এই সাম্যের প্রতিষ্ঠা হবে। অনেকে বলেন যে সমাজতন্ত্রবাদের ( Socialism ) মার্কসই প্রথম প্রবর্ত্তক নন, তৎপূর্ব্বে রবার্ট ওয়েন্ এর নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন। রবার্ট ওয়েন যা করে গেছিলেন তা শ্রমিক ও ধনিকের ভেতর নীতিপূর্ণ সম্পর্ক

সংস্থাপনের প্রচেষ্টা, তাকে সত্যিকারের সমাজতন্ত্রবাদ বলা যায় কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া মানব সভ্যতার পরিণতিতে রাষ্ট্রহীন শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা মার্কসেরই নিজস্ব। ধনিকের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারাদের বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি যা ভবিষ্যৎবাণী করে গেছিলেন রুশিয়াতে তা সার্থক হয়েছে, তবে তাঁর পরিকল্পনায় এ রক্তযুদ্ধ ছিল না। তিনি আশা করতেন যে মানসিক বিপ্লবেই আসবে সমাজে শ্রেণীগত বৈষম্যের বিলুপ্তি।

স্বাধীনতা অভিযানে মার্কসবাদ একটি অভিনব পথের নির্দ্দেশ। স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থান এর ভেতর নেই। এই মতানুসারে ব্যক্তিমাত্রই সমাজের অঙ্গ, এর বাইরে কারুর কোন সত্তা নেই। সমাজে শ্রেণীভেদ উঠে গিয়ে অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপিত হলেই একমাত্র স্বাধীনতা ভোগ করবার উপায় আছে, তা ছাড়া যা স্বাধীনতা, বাস্তব জগতে তার কোন মূল্য নাই। মার্কসের মতে অর্থনৈতিক অবস্থানুসারেই সমাজের ব্যবস্থা চিরকাল পরিকল্পিত হয়ে এসেছে। সম্পদ সৃষ্টি করতে প্রয়োজন ভূমি ( Land ), সঞ্চিত অর্থ (Capital ) ব্যবসা বুদ্ধি ( Business Organisation ) ও কায়িক শ্রম ( Labour )। এ চারিটির ভেতর যেটি বেশী পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে ও অন্যকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে সক্ষম হয় সমাজে সেই পায় উচ্চতম স্থান ও সেই সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেও তার অধিকার অব্যাহত হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ প্রথম তিনটিই শ্রেণীবিশেষের অধিকারে যাওয়ায় তারাই শ্রমিকদের ওপর অন্যায় জুলুম করে ইচ্ছামত তাদের সর্ত্ত এদের দিয়ে মানিয়ে নিচ্ছে। শ্রমিকদের তারা যা অনুগ্রহ করে দিচ্ছে তা নিয়েই কোন ক্রমে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে হচ্ছে। সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কারু থেকে কম নয়। হয়ত সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমিকদের দৈনিক ৬ ঘণ্টা পরিশ্রমের যথার্থ মূল্য তার গ্রাসাচ্ছাদনের

পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু অন্যায় ব্যবস্থা ও বণ্টনের জন্য তাকে সে মূল্য পেতে হয় দিনে ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করে। ফলে তার পরিশ্রমের অর্দ্ধেক মূল্য চলে যায় অন্যত্র যেটা কর, সুদ ও লাভ আকারে অন্যদের ঘরে গিয়ে ওঠে ও শ্রমিকদের বঞ্চিত করে তাদেরই ভোগে ব্যবহৃত হয়। এটাই হচ্ছে বর্ত্তমান জগতে ধনিকের স্বার্থে সর্ব্বহারাদের শোষণ। এ সম্ভব হতো না যদি জমি ও অর্থ সমাজের সম্পত্তি হত ও সমাজ নিজে শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের ভেতর সৃষ্ট সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করে দিত। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শ্রমিকরা ব্যক্তিগত ভাবে দুর্ব্বল হলেও সমষ্টিগত ভাবে দুর্ব্বল নয়। ধনিকরা অর্থ সৃষ্টি করতে কারখানা বানিয়ে শ্রমিকদের একত্রিত করলে ও শ্রমিকরা তাদের চেতনা ফিরে পেয়ে সমষ্টিবদ্ধ হলে তারাও তাদের শক্তি বুঝতে পারে। তাই মার্কস মনে করে গেছেন যে এমন সময় আসবে যখন এই সর্ব্বহারার দল সমষ্টিগত শক্তির প্রভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ভার নিজ অধিকারে নিয়ে এই শ্রেণীগত বৈষম্য নির্ম্মূল করে দিবে। সেই সময় এই সর্ব্বহারাদের শাসন পদ্ধতি একচ্ছত্র অধিকার ( Dictatorship of the Poletariat ) হওয়া প্রয়োজন নইলে পাল্টা বিপ্লব ( Counter Revolution ) হওয়া স্বাভাবিক ও সর্ব্বহারাদের পদচ্যুত করে ধনিকের পুনর্ব্বার রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করাও বিচিত্র নয়। কিন্তু এ কঠোর ও কেন্দ্রীভূত শাসন বেশীদিনের জন্য পরিচালনা অসমীচীন। শ্রেণীগত পার্থক্য সমাজে নির্ম্মূল হয়ে গেলে সেখানে বিবাদ বিসম্বাদের স্থান নেই, তখন প্রভাবশালী রাষ্ট্র, এমন কি কোন রাষ্ট্রেরই আর প্রয়োজন থাকবে না, ও প্রত্যেকেই সমাজের জন্য কাজ করে ও সমাজ থেকে নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী পেয়ে, বাধাহীন শান্ত জীবন যাপন করতে পারবে। এই হল মার্কস মতবাদে পূর্ণ স্বাধীনতার রূপ, যাকে

আদর্শ করে সোভিয়েটরা রুশিয়ার সমষ্টি-সমাজ ও নতুন গণতন্ত্রের পরিকল্পনা করেছেন।

রুশিয়ার বিপ্লবের ফলে সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সেখানে জনসাধারণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য যে খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে সারকে সিংহাসনচ্যুত করবার আটমাস পরেই লেলিনের অধিনায়কত্বে বলশেভিকরা কেরেনস্কি শাসকদের অপসারণ করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করবার পর আজ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে সেখানে চালিয়ে আসছেন তাদের একচ্ছত্র শাসন ( Dictatorship ) ও এখনও শিথিল হয় নাই সে রাষ্ট্রের নাগপাশ। শ্রেণীহীন সমাজ যদি তাঁরা গড়ে তুলেই থাকেন তবে কঠোর নাগপাশেরই আর প্রয়োজন কি, আর সে শাসন পরিচালনা করবার জন্য স্বাধীন মতামত প্রকাশের পথে এত বাধা নিষেধেরই বা কি সার্থকতা ? তা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন ধর্ম্মমত পোষণ করা, নিজ ইচ্ছানুযায়ী মতামত প্রকাশ ও অপরের মতাবলীর পর্য্যালোচনা করার অধিকার সকলেরই আছে, তাকে টুঁটি চেপে বন্ধ করা স্বাধীনতার অনুকূল নয়। জগৎকে বাদ দিয়ে অংশ বিশেষের সংস্কারে কখনও কোন আদর্শে পৌছান যায় না ও যতদিন অন্যত্র শ্রেণীভেদ ও অসাম্য থেকে যাবে ততদিন সোভিয়েট রাজ্যে কঠোর রাজ্যশাসন ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করতে থাকবেই। স্বাধীন মতবাদের জন্য বিপ্লবের অন্যতম নেতা ট্রট্‌স্কির ( Trotsky ) লাঞ্ছনা সকলকেই সচকিত করে দেয় সে দিকটাতে। সমষ্টিগত মতামতই যে নির্ভুল ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ও তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ ও প্রচার সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর এমন কথা আজ আর কেউ বলবে না। যীশুখৃষ্ট, গ্যালিলিও এমন কি কার্ল মার্কস যে মতামত প্রচার করে

গেছিলেন তা তখনকার সমাজ বরদাস্ত করতে পারেনি। স্বাধীন মতামত প্রচারের জন্য তাঁদের অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে, কারো কারো প্রাণও দিতে হয়েছে। কিন্তু একথা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে ঐ সব মনীষীরা যদি তখনকার সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে নিজেদের স্বাধীন মতবাদ না প্রচার করে যেতেন তবে মানব সমাজকে থাকতে হত অনেক কিছু সত্যের সন্ধান থেকে বঞ্চিত হয়ে। প্রগতিশীল ও স্বাধীন মতবাদ চট্ করে সমাজ কখনও মেনে নিতে পারে না, কিন্তু কোন রাষ্ট্রেরই সে মতবাদ প্রকাশ ও প্রচারের পথে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই। সমাজের কল্যাণের জন্য সমাজের বিরোধিতা করবার প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। বর্ত্তমান জগতে সমাজের বাইরে ব্যক্তিবিশেষের কোন স্থান নেই বলেই প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে সমাজকে এরূপ ভাবে গড়ে তুলবার অধিকার যা তার আত্ম উপলব্ধিতে পূর্ণ সহায়ক হয়। যে রাষ্ট্র তা না মানে ও ব্যক্তি-বিশেষের এ চেষ্টাতে বাধা সৃষ্টি করে তাব আদর্শ আর যাই হউক না কেন স্বাধীনতা নয় তা নিঃসন্দেহ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক কূটনীতির আশ্রয় নিতে গিয়ে সোভিয়েটরা সত্যি তাদের আদশ থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে কিনা তাও একটা ভাববার কথা। তবে এও ঠিক যে আন্তর্জাতিক বিপ্লব ঘটে পৃথিবী থেকে শ্রেণীগত অসাম্য দূর না হওয়া পর্য্যন্ত সোভিয়েটের পক্ষে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা একান্ত কষ্টসাধ্য।

একটা প্রশ্ন এখানে মনে আসতে পারে যে মানুষ সমাজের জন্য না সমাজ মানুষের জন্য। সমাজতন্ত্রবাদীর মতে ভাবরাজ্যে সমাজের বাইরে মানুষের সত্তা অকল্পনীয়, একমাত্র সমাজের অঙ্গ হিসাবেই তার

স্থান। সমাজ যেটা কর্ত্তব্য ও কল্যাণকর মনে করবে প্রত্যেকের তা করবার অধিকারই স্বাধীনতার একমাত্র রূপ, এ ছাড়া তার আর কোন রূপ বা প্রকাশ নেই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই আছে একটা অন্তর্জগৎ, যেটা তার নিজস্ব। যাতে সমাজে অন্যের ওপর ঘাত প্রতিঘাত হওয়া অবশ্যম্ভাবী সেখানে সমাজের দাবী অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত, অন্তরের স্নেহ ভালবাসা, সৌন্দর্য্য স্পৃহা, প্রকৃতি সম্ভোগে মনের উৎকর্ষ ও আনন্দ ও সর্ব্বোপরি সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধে আপন মতামত গঠন ও প্রকাশ প্রত্যেকেরই নিজস্ব, সেখানে রাষ্ট্রের বা সমাজের কোন দাবীই টিকতে পারে না, আর সে দাবী ন্যায়সঙ্গত ও নয়। রুশিয়ায় এসব বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থান কতটা আছে বা নাই তা বলা কঠিন।

### বিংশ শতাব্দী : তুরস্কের বিপ্লব আয়রল্যাণ্ডের স্বরাজ ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন

বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম জগতে রুশিয়ার বিপ্লবের পরই নতুন তুরস্কের জাগরণ স্বাধীনতার অভিযানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তুরস্ক শ্বেতজাতি সমাজে চিরদিনই পরিগণিত হয়ে এসেছে ইউরোপের রোগদুষ্ট অঙ্গ রূপে ( Sick Man of Europe )। তুরস্কের বাস্তব ও কাল্পনিক অত্যাচারের কাহিনীতে ইউরোপ ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরা। ধর্ম্মের নামে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ যখন একত্রে মিলে তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছিল তখন তুরস্কের একাই বাঁচাতে হয়েছিল তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য। প্রবল প্রতাপান্বিত রুশিয়া-অধিপতি সারের তুরস্কের উপর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল চিরদিনই ও হয়ত রুশিয়ার শক্তিবলে বহুপূর্ব্বেই দেশটা

অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ত বৃহৎ রুশিয়ার গহ্বরে যদি না ইউরোপের অন্যান্য জাতি শক্তি—সমন্বয়ের ( Balance of Power ) জন্য দরকার মনে করত এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখবার। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, এই শক্তি সমন্বয়ের প্রয়োজনই ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বা তথাকথিত স্বাধীনতা বাচিয়ে রেখেছে, নইলে সুইজারল্যাণ্ড, বেল-জিয়াম, হল্যাণ্ড, এবং বলকানের ছোট ছোট রাজ্যগুলির অস্তিত্ব অনেক আগেই উঠে যেত ইউরোপের মানচিত্র হতে ও তারা অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ত নিকটতম কোন বৃহৎ রাজ্যের। গত প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর সঙ্গে তুরস্ক যোগ দেয় ও শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়ে যে সর্ত্ত তাকে মানতে হয় তা ছিল তার পক্ষে খুবই অপমানজনক। ১৯১৯ সালে জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের ফলে তুরস্কে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়; ফলে প্রতিষ্ঠিত হল এঙ্গোরাতে দুইটি শাসনতন্ত্র। ১৯২২ সালে এল তুরস্ক গ্রীসের সংগ্রাম। নবীন জাতীয়তা প্রমত্ত তুরস্ক সে যুদ্ধে জয়লাভ করে, ফলে সে বছরের ১লা নবেম্বর জাতীয়তাবাদীদের দাবীতে সুলতান রাজ্যের হল অবসান ও ১৯২৩ সালের ২৯শে অক্টোবরে মুস্তাফা কামাল পাশাকে অধিনায়ক করে তুরস্কে প্রতিষ্ঠা হল প্রথম গণতন্ত্র (Rep-ublic)। তখন থেকে জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্যশাসন তুরস্কে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় ও তারই ফলে তুরস্ক ধর্ম্মের গোঁড়ামি থেকে রাষ্ট্রশাসন মুক্ত করে অনেক কিছু সংস্কার করে ফেলেছে যার ফলে সে আজ সভ্যসমাজে উন্নতিশীল ও অগ্রগামী জাতি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠ।

স্বাধিকার প্রমত্ত আয়ারল্যাণ্ডের বিরাট বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান ও শেষ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী। আয়ারল্যাণ্ড সে ভাবে কখনই ইংলণ্ডের অধীনস্থ হয়নি। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের আগে তাদের শাসন কার্য্য স্বতন্ত্র

পার্লামেণ্ট দ্বারাই চালিত হত। পাশাপাশি অবস্থিত বলেই ইংরেজ ও আইরিশ এ দুজাতির ভেতর বিবাদ ও বিসম্বাদ চিরদিনই চলে এসেছে। এ বিবাদের প্রধান কারণ ছিল পরস্পরের ধর্ম্মমতবাদের বিরোধিতা। আইরিশরা রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মবাদী হওয়ায় প্রোটেস্টাণ্ট ইংলণ্ডবাসী চিরদিনই তাদের উৎপীড়ন করবার সুযোগ নিয়েছে ও এ নিয়ে রক্তপাতও হয়ে গেছে অনেক। ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারীতে অবিশ্যি এ দুজাতির মিলন সংঘটিত হয় ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তখন থেকে দুই রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করে। দুর্ব্বল ও সবলের মিলনে যা হয় এক্ষেত্রে তাই হল, আয়রল্যাণ্ডের অধিবাসী সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়াতে শাসনতন্ত্রে তাদের মত বড় একটা খাটল না। দুইদেশের অভিজাতবংশীয় লোকদের ভেতর তেমন কিছু পার্থক্য না থাকলেও সাধারণ শ্রেণীর ভেতর মূলগত পার্থক্য ছিল দুর্ভেদ্য। এই মিলনের পর আয়রল্যাণ্ডের গণসাধারণ ইংলণ্ডের কূটনীতির ভেতর পড়ে, ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে শোষিত হতে হতে ক্রমশই নিঃস্ব হয়ে পড়ে; ফলে ১৮৭৪ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের পর প্রতিনিধিবর্গের ভেতর আয়রল্যাণ্ডকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে রূপান্তরিত করবার সাড়া পড়ে যায়। এই আন্দোলন শেষ পর্য্যন্ত আয়রল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র শাসন বা হোমরুলের দাবী জানাতে থাকে। তখনকার ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন এ দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন ও ১৮৮৬ সালে তিনি প্রথম আইরিস্ হোম রুল বিল্ পার্লামেণ্টে পেশ করেন। এর ফলে অবিশ্যি তাঁকে তখনই মন্ত্রীত্ব হারাতে হয় ও কিছু কালের জন্য ইংলণ্ডে রক্ষনশীল দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ সালে গ্ল্যাডষ্টোন পুনরায় মন্ত্রীত্বে ফিরে আসেন ও ১৮৯৩ সালে তাঁর দ্বিতীয় আইরিস্ হোম রুল বিল কমন্স সভায় পাশ হয়. কিন্তু লর্ডস সভার বিরোধিতায় তা তখন কার্য্যকরী হতে পারেনি।

১৯১২ সালে বিটিশ প্রধান মন্ত্রী এসকুইথ তৃতীয় আইরিশ হোম রুল বিল পেশ করেন ও গত প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে এ বিল পাশ হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি বিল পাশ হয় যার মর্ম্ম ছিল যে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বিলের কিছুই কার্য্যকরী হবে না। প্রথমে সমস্ত আয়রল্যাণ্ডকেই ঐ বিল অনুযায়ী হোমরুল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু শেষে আবার তা বদ্‌লিয়ে আলষ্টারকে তার থেকে বাইরে রাখা হয়। আয়রল্যাণ্ডের এই হোমরুলের সব চেয়ে বড় প্রতিবাদ করেন একজন আইরিশ ব্যবহারজীবী স্যার এডওয়ার্ড ( ও শেষে লর্ড ) কারসন্। আলষ্টারের আয়রল্যাণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন করার দাবী তার রক্তাক্ত অভিযানকে সর্বদা সঞ্জীবিত করে রেখেছে। কারসনকে তার দেশদ্রোহী অভিযানে সাহায্য করার লোকের অভাব ইংলণ্ডে হয়নি। যুদ্ধশেষে যখন আয়রল্যাণ্ডের হোমরুলের দাবী অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে তখন ইংলণ্ড থেকে একদল স্বেচ্ছাসেবক ( ইতিহাসে যাদের ব্ল্যাক ও ট্যান আখ্যা দেওয়া হয়েছে ) সেখানে গিয়ে আয়রল্যাণ্ড বাসীর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করে এসেছে তা পৃথিবীর যে কোন বর্ব্বরতাকে হার মানিয়ে দিতে পারে। এ বর্ব্বরতার পেছনে ইংলণ্ডের রাজশক্তির সহানুভূতির অভাব হয়নি, বস্তুত এই ছিল ইংলণ্ডের শেষ অস্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিসম্বাদের ওপর ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। লর্ড কারসনের আইরিস হোম রুল এর বিরোধিতা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ অবলম্বন ও একে আশ্রয় করে তারা আয়রল্যাণ্ডকে তাদের তাঁবে রাখতে খুবই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আইরিশ জাতির দৃঢ়তা শেষ পর্য্যন্ত সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।•

১৯২১ সালে আইরিশ হোম রুল আইন হয় ও সে আইন অনুযায়ী আয়রল্যাণ্ডে দুইটি পার্লামেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। উত্তর পার্লামেণ্টের

প্রথম অধিবেশন ১৯২১ সালের ২২শে মে ঠিকমতই হয় কিন্তু দক্ষিণ পার্লামেণ্ট আদৌ বসলনা। পরিবর্ত্তে তারা সেই সব প্রতিনিধি নিয়ে আয়রল্যাণ্ডে ডেইল ইয়ারান্ ( Dail Eireann ) নামক পরিষদ গঠন করে, ও ডি ভেলারাকে তার সভাপতি পদে বরণ করে। এই পরিষদ স্বাধীন ইয়ারা গণতন্ত্রের রাষ্ট্রসভা হিসাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা আরম্ভ করে দেয়। ইংল্যাণ্ডের তখন বেশীদিন এর বিরোধিতা চালাবার ক্ষমতা ছিল না, শেষ পর্য্যন্ত এই পরিষদের প্রতিনিধিদের লণ্ডনে আমন্ত্রণ করে আনা হল। অনেক বাগ্ বিতণ্ডার পর যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাতে ঠিক হল যে প্রোটেস্টেণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী আলষ্টারকে বাদ দিয়ে বাকী আয়রল্যাণ্ড একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র রূপেই স্বীকৃত হবে, কেবল তাদের ব্রিটিশ নৃপতির আনুগত্য স্বীকার করে নিতে হবে। ডি ভেলেরা এ চুক্তিতে মত দিতে পারেন নি, আলষ্টারের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার তিনি আয়র-ল্যাণ্ডে ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রাখার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু বলে মেনে নেননি। ব্রিটিশ নৃপতির আনুগত্যেও তার সম্মতি ছিল না। কিন্তু কলিন্স প্রভৃতি অনান্য প্রতিনিধিরা তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ায় তখনকার মত তিনি পরাজিত হন ও ফলে গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করতে গিয়ে কিছু-দিনের জন্য তাকে স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্রের সেনার সঙ্গে যুদ্ধও করতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত আবার ডি ভেলেরা এই পার্লামেণ্টে ঢোকেন ও এর নায়কত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের সময় ডি ভেলেরা নতুন আইন প্রণয়ন করে সম্রাটের প্রতিনিধির পদ আয়রল্যাণ্ড হতে তুলে দেন। বস্তুতঃ এখন আয়রল্যাণ্ড সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আয়রল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ।

[ প্রাচীন চীনের সমাজ পরিকল্পনা : সপ্তদশ শতাব্দীর চীন : বিদেশী শোসণের প্রতিক্রিয়ায় চীনের নবজাগরণ : বক্সার বিক্ষোভ ও পরবর্ত্তীকাল : চীনের বর্ত্তমান অভিযান ]

বিংশ শতাব্দীতে চীন ও ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অভিযানের উৎস মূলতঃ এক, যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে চীন স্বাধীন রাষ্ট্র ও ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীন। যে সূত্রকে আশ্রয় করে এ দুই মহাদেশে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়েছিল তা উভয় ক্ষেত্রেই বিদেশীর শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। চীন ও ভারতের প্রাচীন সভ্যতা থেকে বর্ত্তমান জগৎ অনেক কিছু পেয়েছে, অনেকে অবিশ্যি তার যথোচিত মর্য্যাদাও দিয়েছে কিন্তু বেশীর ভাগই করেছে তার অবমাননা ও সেই সঙ্গে পরিচয় দিয়ে গেছে আপন মূর্খতার। তাই আজ এই পরমানবিক শক্তি অপব্যবহারের যুগে অনেকেই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এই পূর্ব্বাচলের পানে যদি তারা পারে তাদের প্রাচীন সভ্যতার কোন গ্রন্থি হতে উদ্ধারের কোন পন্থা বাতলিয়ে দিতে।

খৃষ্টজন্মের পাঁচশ বছর আগেই চাউ দার্শনিকেরা করে গেছিলেন এমন সমাজ সংগঠনের পরিকল্পনা যার ভেতর ব্যক্তি মাত্রই পেতে পারে পরিপূর্ণ সুখ ও আত্ম উপলব্ধির উপায়। দার্শনিক কনফুসিয়াস Confucius) এর মতে সমাজে নীতি সংস্থাপন, নীতি শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে জনগণ সংগঠনই প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারের উপায়। তাঁরপরে জন্মে মেনসিয়াস ( Mencius ) স্থির বিশ্বাসে বলে গেছেন যে মানুষের প্রকৃতিতে মূলতঃ সৎ ছাড়া অসৎ কিছু নেই ও মানব প্রবৃত্তিতে যা কিছু জঘন্যতার ছাপ পড়েছে তার জন্য দায়ী একমাত্র সমাজের অন্যায় ও অবিচার। জনসাধারণ চিরকালই এ অন্যাওয় অবিচারে উৎপীড়িত হয়ে আসছে ও শাসক সম্প্রদায় নিজেদের কর্ত্তব্য

ভুলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের উৎপীড়নে সাহায্যই করেছে। তাঁর মতে স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ করবার ন্যায়তঃ অধিকার আছে। টা ও টি চিং (Tao Te Ching) এর মতে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মানুষকে ছেড়ে দিলেই আসবে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ। মানুষের নিজের তৈরী বিধি নিষেধই সমাজকে কলঙ্কিত করেছে। সমাজের মুক্তির জন্য প্রয়োজন প্রত্যেককে নিজের স্ব স্ব অধীনে ছেড়ে দেওয়া, একমাত্র তাতেই সে পাবে আত্ম উপলব্ধি, ও স্ব অধীনে আত্ম উপলব্ধি প্রত্যেকেরই অভিন্ন বলে এতে কোন বিবাদ বিসম্বাদও ঘটবে না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র হিসাবে চৈনিক শক্তি খুবই হ্রাস পায় ও সেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন জাতি ধর্ম্মপ্রচার ও বাণিজ্যের মানসে চীন মহাদেশের অনেক জায়গায়ই বেশ ভাল ভাবে জুড়ে বসে। শুধু পাদ্রী ও ব্যবসায়ীই যে এসেছিল তা নয়, তাদের সঙ্গে এসেছিল তাদের প্রাণ ও স্বার্থ রক্ষার্থ প্রভূত সেনানী ও কামান বন্দুক। ফলে চল্‌ল বাণিজ্য ও ধর্ম্মপ্রচারের নামে শোষণ ও পেষণ, যাতে চীনকে ক্রমেই বিদেশীর স্বার্থে অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হ'ল স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে যা একান্ত অপরিহার্য্য। অবিশ্যি একমাত্র নিরুপায় হয়েই চীন রাষ্ট্রের সে সব ছেড়ে দিয়ে তদনুযায়ী ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। বিদেশী শোষণকারীর দলে একমাত্র ইউরোপীয় প্রতাপশালী রাষ্ট্রগুলিই ছিল না, এতে ক্রমে এসে জুটেছিল রুশিয়া, জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীনে জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে ও'ঠে ও বিদেশীদের এই অত্যাচার তাদের মনে জাগায় স্বাভাবিক বিরক্তি ও বিদ্রোহ। প্রগতিশীল যুবকদল অলৌকিক উপায়ে বিদেশীর বন্দুকের গুলি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে কিনা তাই আবিষ্কার করতে

আরম্ভ করে দিল তাদের সনাতন প্রথায় হোম ও যজ্ঞ। এদের বিদেশীরা বক্সার ( Boxer ) নাম দিয়ে ঠাট্টা করত। "বিদেশী দানবদের ধ্বংশ করে দেশকে রক্ষা করতে হবে" এই ছিল এদের যুদ্ধ-মন্ত্র। শেষ পর্য্যন্ত এ বিক্ষোভ ব্যাপক হয়ে উঠে প্রকাশ পেল বিদেশীদের ওপর জনতার আক্রমণের ভেতর। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঠিক শেষ দিন একজন ইংরেজ পাদ্রী জনতার হাতে প্রাণ হারায়। তারপর এল রীতিমত রক্তারক্তি যার ফলে জার্ম্মান পররাষ্ট্র-সচীব তার মহামূল্য প্রাণ হারিয়ে বিদেশীদের মনে জাগিয়ে তুল্‌ল দারুণ জিঘাংসা। বিদেশীর সবাই একজোটে লেগে গেল চীনের বিরুদ্ধে। সে প্রচণ্ড শক্তির আক্রমণ চীন রুখ্‌তে পারল না ও পরিশেষে যে চুক্তিপত্রে সমস্ত মীমাংসা হল তা যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষেই একান্ত অপমানজনক। বস্তুতঃ চীনকে সে রকম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কেউ মনে করত না ও হয়ত বিভিন্ন জাতিগুলি দেশটাকে নিজেদের ভেতর ভাগও করে নিত যদি না তাদের নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে বিসম্বাদ না থাকত ও যদি তারা বিনা যুদ্ধে একমত হয়ে করতে পারত একটা বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা।

বক্সার বিক্ষোভ ও সম্মিলিত বিদেশী জাতির উৎপীড়নের পর রাষ্ট্র শক্তি চীনে খুব ক্ষীণ হয়ে পড়্‌লেও সেখানকার গণশক্তি বৃদ্ধিই পেয়েছিল ও প্রগতিশীল দল ক্রমেই ক্ষমতা সংগ্রহ করে ভেতর ও বাইরের থেকে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রবর্ত্তনের দাবী জানাতে লাগ্‌ল যার ফলে ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল চীন গণতন্ত্র বা রিপাবলিক। বিভিন্ন দলের মিলনের জন্য এ সময় সানিয়াৎসেন যে আত্মত্যাগ করেছিলেন তা চীন ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। ইউন্‌ শি কাই তখন ছিলেন মান্‌চাস্‌ রাজবংশের শিশু রাজার প্রধান সচীব। গণতন্ত্রকে উপেক্ষা

করা আর চলে না সেটা তিনি বুঝেছিলেন, তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল শাসনতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিদের কিছু অংশ দিয়ে নৃপতির শাসন বজায় রাখ্‌বার, কিন্তু গণতন্ত্রবাদীরা রাজী হল না সে প্রস্তাবে। ফলে ১৪টি প্রদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ন্যান্‌কিংএ সানিয়াৎসেনকে সভাপতি পদে বরণ করে গণতন্ত্রেব প্রতিষ্ঠা করল। ১২ই ফেব্রুয়ারীতে যখন ইউন শি কাই গণতন্ত্রবাদীদের সর্ত্ত মেনে নিতে প্রস্তুত হন ও শিশু রাজাকে দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ পত্র লিখিয়ে নেন তখন সকল দলের মিলনের জন্য সানইয়াৎসেন সভাপতির পদ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে ইউন্ শি কাই এর অধিনায়কত্বে গণতন্ত্রের শাসন মেনে নিলেন। নতুন গণতন্ত্র সেখানে আজ ত্রিশ বছরের ওপর দেশে স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কারের জন্য কাজ করে চলেছে কিন্তু বিদেশীর প্রভাব ও তাদের অর্থনৈতিক শোষণ প্রতি পদেই তাদের বাধা সৃষ্টি করায় না পেরেছে তারা মনোমত কাজ করতে, না পেরেছে দেশের বিভিন্ন দলেব ভেতর বিবাদ বিসম্বাদ মেটাতে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবিশ্যি কিছু কালের জন্য এ ঘরোয়া বিবাদ থেমে ছিল কিন্তু যুদ্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আজ আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে চীনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মিত্র শক্তির পক্ষে জার্ম্মানীর বিরোধিতায় নামতে বাধ্য করা হয়েছিল। অনেক চীনবাসীই যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে প্রাণ দিয়েছিল আর যুদ্ধের মাল মসলা তৈরীর কাজে শ্রমিক হিসাবে চীন যা দান করেছিল তা অপরিসীম। যুদ্ধে জয়লাভের পর চীন আশা কর্‌ছিল যে এবার তারা তাদের ত্যাগের মূল্য স্বরূপ সত্যিকারের স্বাধীনতা ফিরে পাবে কিন্তু ভারসাইয়ে শান্তি সম্মেলনে গিয়ে তাদের মোহ গেল ঘুচে। চীনের দাবী ছিল চীন থেকে জার্ম্মানরা পূর্ব্বে যে সান্‌টাঙ্ প্রদেশ নিয়েছিল তা চীনকে পুনরায়

ফিরিয়ে দেওয়ার, চীন থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য, বিদেশী ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তুলে নেওয়ার, বিদেশী কন্সাল কর্তৃক শাসন অপনোদনের, বস্তুতঃ চীনকে পুরোপুরি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে মেনে নেওয়ার। তার সবই যখন শান্তি সম্মেলনে ( Peace Conference ) ও আন্তর্জ্জাতিক সংঘে ( League of Nations ) তাদের আলোচনার অধিকার বহির্ভূত বলে সাব্যস্ত হল তখন নিরাশ ও তিক্ত হয়ে সেখান থেকে ফেরা ছাড়া চীন প্রতিনিধিদের আর গত্যন্তর রইল না। চীনের প্রতি আমেরিকার পরবর্ত্তী ভালবাসা জাপানকে রুখবার জন্য, নিজেদের অর্থনৈতিক শোষণের প্রলোভন তারা ছাড়্তে পারেনি, তাই তারা সান্টাঙ্গ সম্বন্ধে চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করতে এগিয়ে আসেনি।

১৯২৬ সালে সান্ইয়াৎসেন ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর অনতি-পূর্ব্বে তিনি "সান্ মিন্ চু" নামক প্রবন্ধে চীনজাতিকে তাদের ভবিষৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়ে যান। তিনি বলে যান যে চীনজাতির তিনটী লক্ষ্য মনে রেখে কাজ করতে হবে, যথা গণতান্ত্রিক শাসন, জনগণের আর্থিক উন্নয়ন ও দেশের অধিকার যা বিদেশী হরণ করে নিয়েছে তার পুনরুদ্ধার। যতদিন পর্য্যন্ত না দেশের সব সম্প্রদায় একত্রিত হবে ততদিন পর্য্যন্ত এক সম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌমত্বে শাসন প্রয়োজন, যদিও চীনের চরম লক্ষ্য রাখতে হবে জনগণের শাসনের দিকে। কুমিন্ট্যাং ( Kuomin tang ) অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী দলের হাতে বর্ত্তমানে একছত্র শাসন ভার রাখাই স্বাধীনতার অনুকূল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই নির্দ্দেশ অনুসরণ করে চাংকাইশেক চীনে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের লক্ষ্য পথে বাধা দাঁড়িয়েছিল প্রধানতঃ বিদেশের, বিশেষ করে জাপানের স্বার্থ ও তথাকার কম্যুনিষ্ট দল যার পিছনে সর্ব্বদাই আছে রুশিয়ার বিরাট শক্তির ছায়া।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যা দিয়ে সমাজে সাম্য ও মৈত্রী সংস্থাপন হওয়া সম্ভব, তা কুমিনট্যাং দলের ও লক্ষ্য সুতরাং কম্যানিষ্টের সঙ্গে মূলতঃ তাদের আদর্শের কোন ভেদ থাকার কথা নয় ও এ দুয়ের সংঘাত অস্বাভাবিক। কিন্তু দলগত প্রাধান্য যেখানে রাষ্ট্রনীতির মূল সেখানে বিসম্বাদ থেকেই যাবে ও স্বাধীনতার অভিযানে অনর্থ অন্তরায় সৃষ্টি করতে থাকবে।

* * * * *

(উনবিংশ শতাব্দীর মোহগ্রস্ত ভারতবাসী : প্রথম প্রতিক্রিয়া সিপাহী বিদ্রোহ : ভারতের আত্মচেতনায় রাজারামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজের দান : স্বামী দয়ানন্দ ও আর্যসমাজ : শ্রী রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন : অ্যানি বেসান্ত ও থিওসোফিক্যাল সোসাইটি)

একাধিক শতাব্দীর দাসত্বের কলঙ্ক মাথায় বয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোহগ্রস্থ ভারতবাসী তার চেতনা ফিরে পেতে আরম্ভ করে। ইংরাজ যখন ভারতে আসে তখন রাজ্যসংস্থাপনের চিন্তা ছিল তার কল্পনার বাইরে। সুদূর মহাদেশে যে তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হবে একথা সে স্বপ্নে ও ভাবিনি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এসেছিল বাণিজ্য ও অর্থলাভের আশায় ও তার জন্য যা সাজ সরঞ্জাম প্রয়োজন একমাত্র তাই তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরস্পরের ঈর্ষ্যায় ঈর্ষ্যান্বিত বিভিন্ন সম্প্রদায় বিদেশীর মোহে পড়ে তাকেই ভারত সিংহাসনে বসাল, একবারও চিন্তা করল না যে এর পরিণতি কোথায়! সত্যি বলতে গেলে

আমাদের স্বখাত সলিল। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে অনেক বিজেতা এসেছে, শক, হুন, মোগল, পাঠান অনেকেই ভারতের বুকের উপর তাদের বিজয় নিশান উড়িয়ে গেছে কেউ হয়ত হত্যা লুণ্ঠন করে দেশে ফিরে গেছে আর কেউ বা এখানে চিরকারের জন্য ঘর বাধা বেধে ভারতবাসী হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর তারা হাত দিতে পারেনি। মোগলের সত্যিকার ও কল্পিত অত্যাচারের কাহিনীতে ইংরাজ লিখিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ, কিন্তু তাদের শাসন কালে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা দুর্ভিক্ষ কিছু ছিল না, দেশের ধনসম্পদ তখন দেশেই থাকৃত অন্যের সম্ভোগের জন্য জাহাজ বোঝাই হয়ে তা ছ হাজার মাইল দূরে চালান হত না। ইংরাজী শিক্ষায় মোহগ্রস্থ ভারতবাসীর এ কথা উনবিংশ সালে একবার ও মনে হয়নি যে সে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাদের রাজত্ব কায়েমী করা, ভারতের সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে ইংরাজী সভ্যতাকে খুব উজ্জল করে দেখানো, ভারতবাসীর মনে বিশ্বাস করিয়ে দেওয়া যে মুসলমান শাসকদের অমানুষিক অত্যাচার দেখেই নিঃস্বার্থ ইংরাজ ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করছে ও ভারতবাসীকে সাত্যকারের সভ্য ও স্বাধীন করে তোলবার জন্যই ইংরাজ শত অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করে এ দেশে রয়ে গেছে। ইংরাজী শিক্ষা থেকে আমরা ভাল কিছু পাইনি একথা বলা চলেনা। বস্তুতঃ মিল, বার্ক, ব্রাইট প্রভৃতির লেখা ও বক্তৃতা হতে অনেক কিছু স্বাধীনতার আদর্শ আমাদের জাতীয় জীবনকে উদ্দীপিত করেছে তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এ শিক্ষার মোহে পড়েই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবাসী নিজের আত্মমর্য্যাদা ভুলে গিয়ে মেকী সাহেব বন্‌তে উঠে পড়ে লেগেছিল, ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে তারাই ছিল অগ্রণী ও বিদেশীর যা কিছু কুসংস্কার, উচ্ছৃঙ্খলতা, তাই তারা সভ্যতার নিদর্শন বলে বরণ করে নিয়েছিল। বিদেশীর তথাকথিত

সভ্যতাব অন্ধ অনুকবণ যে পক্ষান্তরে বর্ব্বরতা সে সত্যটা কবি দ্বিজেন্দ্র লাল দেশবাসীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে জাতীয় ইতিহাসে অমর হয়ে গেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ভাবতবাসীর মনে এ চেতনা তেমন করে জাগেনি।

বিদেশী মোহেব প্রথম প্রতিক্রিয়া আসে অবিশ্যি সিপাহীদের মধ্যে। ১৮৫৭ সালেব সিপাহী বিদ্রোহকে অবিশ্যি স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায় না। সে বিদ্রোহের মূলে ছিল সিপাহীদেব ধর্ম্মমতের গোঁড়ামি। সতীদাহ প্রমুখ কতগুলি প্রথা তারা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত মনে করত ও লর্ড বেণ্টিঙ্ক যখন তা আইনতঃ নিবারণ করে দেন তখনই সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের লক্ষণ দেখা দেয়। এর ওপর লর্ড ডালহৌসির সমাজ সংস্কার ও নবশিক্ষা প্রবর্ত্তনে তাদের মনে সন্দেহ জাগায় যে ভারতবাসীকে ইউরোপীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার অনুগামী করাই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তখন দম্‌দম্ বুলেটে চর্ব্বি ছিল ও তা ব্যবহারে সিপাহীরা আপত্তি করে, কারণ এ ছোঁয়া ছিল তাদের ধর্ম্মমতেব বিবোধী। অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস প্রত্যক্ষভাবে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ হলেও পরোক্ষভাবে জমিদার ও তালুকদারদের প্ররোচনা ও চক্রান্ত ছিল এর সত্যিকারের মূল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্রমে ক্রমে অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ায় ও ডালহৌসির শাসনকালে এ স্বত্বভ্রংশনীতি ( Doctrine of Lapse ) চরমে পৌছানতে এই অভিজাত শ্রেণীর ভেতর দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় ও তাবাই ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহ আনে যাতে পুনরায় মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ও তারা তাদের লুপ্ত অধিকার ফিরে পেতে পারে। এ বিদ্রোহের ভেতর জনগণের সহানুভূতি বা সংযোগ ছিল না, ববঞ্চ অনেকেই নির্ব্বিবাদে ইংরাজকে সাহায্যই করেছিল, তাই

অঙ্কুরেই এর বিনাশ হয়। বিদেশীর শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে অবিশ্যি এর মূল্য কম নয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পরই এল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা ( Queen's Proclamation ) যার ফলে সমস্ত ভারতবাসীই একেবারে কৃত কৃতার্থ হয়ে গেল ও বস্তুতঃ বিশ্বাস করল যে ইংরাজ ভগবান্ প্রেরিত আশীর্ব্বাদ, আমাদের বর্ব্বরতার হাত হতে উদ্ধার করবার জন্যই এদেশে এসেছে। তখনকার প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডারবীর কূট-নীতির ফলে ভারতে আমলাতন্ত্রের ভেতর দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শাসন সংস্থাপিত হল ১৮৫৮ সালে। প্রধানতঃ পাঁচটি মূল স্তম্ভের ভেতর এ সাম্রাজ্যের ভিত্তি গাঁথা হয়, সেদিকে অবিশ্যি অনেক দিন পর্য্যন্ত দেশবাসীর নজরই পড়েনি। একটি হচ্ছে সৈন্যবিভাগ। ইংরাজ অফিসারের অধীনে অনেক সিপাহীকে এর ভেতর টেনে আনা হয়, যারা "সরকার সেলাম" ছাড়া আর কোন মন্ত্র শিখ্‌বার অবকাশ পায়নি। দ্বিতীয় হল চাকুরী, সামান্য লেখাপড়া শিখে মোটা মাহিনায় ইংরাজের অধীনে চাকুরী ভারতবাসীর কাছে খুবই লোভনীয় হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ স্বাধীনতা বিহীন তথাকথিত স্বাধীন নৃপতি বৃন্দ। এদের স্বেচ্ছা-চারিতা ও বিলাস চালাবার পথে ইংরাজই একমাত্র সহায়ক বলে এরাই হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব চেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। চতুর্থ জমিদার ও ধনিক শ্রেণী, যাদের অস্তিত্ব একমাত্র ইংরাজ শাসন ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। এর ওপর ইংরাজ নিয়ে এল সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও কলহ, হিন্দু মুসলমানের ভেতর তাদের ভেদনীতি দিয়ে। সিপাহী বিদ্রোহে প্রধানতঃ মুসলমানেরা সে বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল বলে ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে হিন্দুরাই হল বিদেশীর প্রিয় সম্প্রদায়, কিন্তু কালক্রমে যখন এই হিন্দুরাই জাতীয় আন্দোলনে সব চেয়ে

মুখর হয়ে উঠল তখন তাদের ভালবাসার পাত্র বদ্লাতে সময় লাগল না। এ ভালবাসা ও প্রীতি যে কোনটাই যথার্থ নয়, এ যে ইংরাজ কূটনীতির খেলা, ও সুবিধা অনুযায়ী পাত্র পরিবর্ত্তন করতে পারে, একথাটা আজ পর্য্যন্তও দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম হলো না, জাতীয় জীবনে এই সব চেয়ে বড় কলঙ্ক।

দেশ যখন ইংরাজের মোহে আচ্ছন্ন, যখন প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই সাহেব বনে যাওয়া জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে দেশের হীরক দূরে সরিয়ে বিদেশী কাচ নিয়ে মত্ত, সেই সময় অবতীর্ণ হলেন এক মহামানব, রাজা রামমোহন রায়। তখনকার কুসংস্কার যে ভারতের সত্যিকারের রূপ নয়, ভারতের সংস্কৃতি যে একমাত্র বেদের অন্তর্নিহিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একথাটা তিনিই প্রথম সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজ তাঁর কথা মেনে নিতে পারল না বলেই তাকে নতুন সমাজ সৃষ্টি করতে হয়েছিল, ভারতবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে ফিরিয়ে আনতে, যাতে তারা আবার তাদের লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়ে বুঝতে পারে যে ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য হেয় ত নয়ই পরন্তু যে কোন সভ্যতা হতে অনেক উচ্চতর ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর একেশ্বরবাদ, ধর্ম্মসমন্বয়ের আকাঙ্খা, স্বাধীনতা—প্রীতি ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা পরবর্ত্তী ভারতকে যে প্রভূত অনুপ্রেরণা দিয়েছে তা নিঃসন্দেহ। স্বাধীনতার অভিযানে তার দান অমূল্য।

নতুন ভারতের অভ্যুত্থানের ভেতর রাজনৈতিক আন্দোলনের দান অবিশ্যি সব চেয়ে বেশী, কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের দান ও খুব কম নয়। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ও ভারতের যে চেতনা সঞ্চারে যত্নবান্ হয়েছিল তাতে করেই ভারতবাসী

প্রথম তাদের আত্মমর্য্যাদা ফিরে পেয়েছিল, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সংস্কৃতি, যে সত্যিকারের খাঁটি জিনিষ, তখনকার জাতীয় জীবন যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তার ভেতর যে সত্যিকারের ধর্ম্মের কোন রূপ নেই, এ কথাটা ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিদেশী অনুকরণের গতিকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ভারতবাসীকে তার আত্মমর্য্যাদা ফিরে পাওয়ার সুযোগ উপস্থিত করে।

ব্রাহ্মসমাজ বাংলাদেশে ও মহারাষ্ট্রে খুব প্রভাব বিস্তার করলেও উত্তর ভারতে তেমন প্রভাবশালী হতে পারে নি। তাই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্বামী দয়ানন্দের প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ সেখানে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে, খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ মূলতঃ এক, উভয়ই বেদের মূলমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামী দয়ানন্দের মতে 'পুরাণ' স্বার্থান্বেষী মূর্খ লোকের নির্দ্দেশমাত্র, বেদের সত্যই একমাত্র গ্রহণীয়, পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মনির্দ্দেশ মানার কোন সার্থকতা নেই। আর্য্যসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতকে জাতীয় আদর্শে সংযোজিত করা, তাই বিধর্ম্মীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া, জাত নির্ব্বিশেষে বিবাহাদি প্রচলন তারা তাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলে মেনে নিয়েছিল। জাতীয়তা সংগঠনে স্বামী দয়ানন্দের দান অতুলনীয়।

তারপর এলেন এক যুগ অবতার, দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেশে, অখ্যাত এক কালীমন্দিরের পূজারী রূপে। সকল ধর্ম্মের ভেতরই যে সত্য নিহিত আছে, মুক্তির জন্য যে নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নাই, একথাটা অতি সরল ও নিশ্চিত ভাষায় তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা না পেয়েও জ্ঞানী ছিলেন বলেই তাঁর সামান্য কথাবার্ত্তার ভেতর তখনকার শিক্ষিত সমাজ পেয়েছিল সত্যিকারের জ্ঞানের সন্ধান। তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আশীর্ব্বাদ

মাথায় নিয়ে ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর বাণী প্রচার করে গেছেন, যারা মন দিয়ে তা উপলব্ধি করেছে তারাই হয়ে গেছে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত। ঘুচে গেল সবার মন থেকে বর্ব্বরতার কালিমা, একথা সভ্যসমাজ স্বীকার না করে পারল না, যে ভারতের সংস্কৃতি সত্যিকারের খাঁটি জিনিষ, এর তুলনা পৃথিবীতে আর নাই। জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠায় রামকৃষ্ণ মিশনের দান কখনও ভুলবার নয়। জনগণ ধর্ম্ম সংস্কারে এতদিন বড় একটা স্থান পায়নি কিন্তু স্বামীজি এই দরিদ্র, আর্ত্ত দেশবাসীকে "নারায়ণ" জ্ঞানে এদের সেবাই করলেন তাঁর মিশনের মূলমন্ত্র।

ভারতের নবজাগরণে থিওসোফিক্যাল সোসাইটির দানও অগ্রাহ্য নয়। ১৮৯৩ সালে অ্যানি বেসান্ট মান্দ্রাজে এই সোসাইটি স্থাপন করেন। শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও আত্মচেতনা এই সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় ভারতবাসী এর থেকে অনেক কিছু পেয়েছে যা তাদের সঞ্চিত মোহ ও দাস মনোবৃত্তি অপনোদনে খুবই কার্য্যকরী হয়েছিল।

* * * * *

[ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়ার কথা—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও নিখিল ভারত কংগ্রেস : কংগ্রেসে চরম পন্থীর উৎপত্তি : কার্জ্জেনের বঙ্গবিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়া : হিংস অভিযান ও তার পরিণতি : ইণ্ডিয়ান হোমরুল পার্টী : মুসলমানের ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ মুসলিম লীগ পত্তন—কংগ্রেস ও লীগ ]

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলে রয়েছে এক ব্যক্তিগত বিক্ষোভের ইতিহাস। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ঘোষণায় বলেছিলেন যে তিনি তাঁর ভারতীয় প্রজাকে তাঁর অন্যান্য প্রজার সঙ্গে সমভাবে দেখবেন

ও তাঁদের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য সমভাবে পালন করবেন। ক্যানাডাকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের পর ভারতবাসীদের মনে স্বভাবতঃই এ আশা জেগেছিল যে তারা যোগ্যতা অর্জ্জন করলে একদিন ইংরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদেরও স্বায়ত্ত শাসন দান করবে ও যতদিন ইংরাজ এ দেশ শাসন করবে ততদিন তারা যতদূর সম্ভব তাদের দপ্তরে ভারতীয়দের স্থান করে দিবে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস হল ইংরাজ শাসন তন্ত্রের প্রধান লৌহ বেষ্টনী ( Steel frame ), এর ভিত্তির ওপরই তাদের আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছে ও এরই সহায়তায় তারা সমগ্র দেশে অক্ষুণ্ণ প্রতাপে শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। এই চাকুরীতে ভারতবাসীদের ঢোকার ইচ্ছা ছিল খুবই স্বাভাবিক। এ চাকুরীতে নেওয়ার জন্য বিলাতে যে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হত তাতে ভারতবাসীর চেষ্টা করবার আইনতঃ কোন বাধা না থাকলেও বস্তুত পক্ষে বয়স ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির কড়াকড়ির জন্য ভারতবাসীর পক্ষে তা লাভ সুদূর পরাহতই হয়ে থাকত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন কিন্তু নানা অছিলায় তাঁকে এ চাকুরী না দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়। শেষ পর্যন্ত কুইনস বেঞ্চের ম্যাণ্ডামাস ( Queen's Bench Mandamus ) বলে তিনি এ চাকুরী পান। চাকুরীতে যোগদানের অনতিপরেই সামান্য কারণে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। এ অবিচার তিনি ভুলতে পারেননি। ইংরাজ যে তাদের সুরবাঞ্ছিত সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের ঢুকতে দিতে চায় না, এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে তিনি ১৮৭৬ সালে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ প্রতিষ্ঠা করলেন। সুরেন্দ্র নাথ ছিলেন ম্যাটসিনির ভক্ত, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি অখণ্ড ভারতের ভেতর ঐক্য স্থাপনের চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন।

১৮৭৭ সালে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থীদের উচ্চতম বয়স ২১ হতে ১৯ শে কমান হল, যার ফলে কোন ভারতবাসীর পক্ষে সে পরীক্ষার প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এটা উপলক্ষ্য করে সুরেন্দ্র নাথ লেগে গেলেন তাঁর প্রচার কার্য্যে, সারা ভারতবর্ষ তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, তিনি দেখ্‌তে দেখতে ভারতের সার্ব্বজনীন নেতা হয়ে দাঁড়ালেন ও ভারতীয়দের যে ঐক্য তাঁর জীবনের কাম্য ছিল তাও অনায়াসলব্ধ হল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠা জাতীয়তা আন্দোলনের ইতিহাসের গোড়ার কথা, বল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ ১৮৭৬ সালে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলেই ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের পত্তন তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন প্রযোজনীয় মনে করেছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়মের প্রতিবাদ অছিলায় দেশের জনসাধারণকে জাগিয়ে তুল্‌বে এটা লিটনের খুব মনোমত ছিল না, তাই মুষ্টিমেয় অভিজাত বংশীয় শিক্ষিত শ্রেণী যাতে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা আলোচনা করতে পারে এই জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর মনে জাগে। ১৮৮৫ সালে শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে সভাপতি করে বোম্বাই সহরে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সম্রাটের আনুগত্য ছিল সে সভার প্রথম ও প্রধান প্রস্তাব। সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের ঢুকবার সুবিধা করে দেওয়া, বিচার ও কার্য্যকরী বিভাগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশীদারী করা এই সব আলোচনা ও আবেদনই ছিল তখন কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এও সরকারের তত মনোমত হয় নাই ও কংগ্রেসকে তারা বিদ্রোহের প্রতীক বলেই মনে করত, কারণ আলোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেস অনেক সময় আমলাতন্ত্র বিধানের দোষত্রুটিগুলিও বাদ দিত না ও সে সম্বন্ধে প্রতিবাদও জানাত।

বছরের পর বছর গলা ফাটিয়েও যখন কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ সিংহের নিদ্রায় কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারলেন না তখন সদস্যদের মধ্যে অনেকেই এ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন ও কংগ্রেস নীতির ওপর আস্থা হারালেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক সর্ব্বপ্রথম প্রচার করলেন যে স্বাধীনতায় ভারতের জন্মগত অধিকার আছে ও স্বাধীনতাই জাতীয়তাবাদীর লক্ষ্য ; স্বাধীনতা কিছু দানের সামগ্রী নয়, এ পেতে হলে তা নিজ বাহুবলেই অর্জ্জন করতে হবে, ইংরাজের মুখাপেক্ষী হয়ে তা পাওয়া অসম্ভব। তাই তিনি মারাঠাদের শিবাজীর আদর্শে উৎপ্রাণিত করে জাতি সংগঠনে লেগে গেলেন যাতে তারা একদিন নিজ শক্তিতে স্বাধিকার অর্জ্জনে সফলকামী হয়। কংগ্রেসের নেতারা অবিশ্যি তাদের নীতি ছাড়লেন না, ফলে সেখানে চরম ও নরম দুই পন্থীর ( Extremists and Moderates ) সৃষ্টি হল। নরম পন্থী চিরদিনই ছিল আবেদন নিবেদনের পক্ষপাতী, তাঁদের চরম লক্ষ্য ছিল ইংরাজের অধীনে স্বায়ত্ত শাসন। চরম পন্থীদের আবেদন নিবেদনের ওপর আস্থা ছিল না, তাঁদের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা ও তা লাভের উপায় জনগণের জাগরণ ও তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ইংরাজ শাসন অচল করে দেওয়া।

ইতিমধ্যে এল ১৯০৫ সালে কার্জ্জনের বঙ্গ বিচ্ছেদ। এ বিচ্ছেদ বাঙ্গালীরা মেনে নিতে পারল না। তাদের তীব্র প্রতিবাদে সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠল। মুখে গান ও হাতে রাখী নিয়ে বের হলেন পরবর্ত্তী কালের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন ডোর অবিচ্ছন্ন করে দিতে, বিপিন চন্দ্র লেগে গেলেন বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলনে, সর্ব্বোপরি শোনা গেল সুরেন্দ্র নাথের বজ্রনিনাদ যে ইংরাজ সাম্রাজ্যের গাঁথুনি তিনি আল্গা করে দিবেন ( "I shall shake the British Empire to its very foundation" )। মুসলমানদের এ আন্দোলন থেকে

দূরে রাখবার চেষ্টা ইংরাজ রাজপ্রভুরা খুবই করেছিলেন ও তাদের বুঝিয়েছিলেন যে এ বিচ্ছেদ তাদের সুখ সুবিধার জন্যই করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টি করবার চেষ্টারও ত্রুটি হয়নি। পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার স্পষ্টা-স্পষ্টিই বললেন যে মুসলমান সম্প্রদায়কে তিনি তাঁর প্রিয় পত্নী (favourite wife) রূপে গণ্য করবেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অনেক মুসলমান এ আন্দোলনে যোগ দেয় ও যে সব নেতাদের তীব্র প্রতিবাদ তখন বাংলার জাতীয় জীবন মুখরিত করেছিল তন্মধ্যে অব দুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেন অন্যতম। বঙ্গ বিচ্ছেদ জাতীয়তার অবমাননা বলেই দেশের লোক এমনি ক্ষেপে পড়েছিল যার ফলে ইংরাজকে দেশে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়। ১৯০৬ সালে কলকাতায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাতে সমগ্র ভারত এ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই ১৯০৬ সালের কংগ্রেসেই তার সভাপতি দাদাভাই নোরজি প্রথমে "স্বরাজ" কথাটা ব্যবহার করেন। এ স্বরাজের অর্থ অবিশ্যি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া আর কিছু ছিল না, কিন্তু এর পূর্ব্বে ভুলেও কেউ কংগ্রেসের ভেতর এর দাবী জানায় নি।

দাদাভাই নৌরজির ব্যক্তিগত চরিত্র মাধুর্য্যের ফলে ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের দুইদলের ভেতর বিসম্বাদ চাপা পড়ে গেলেও ১৯০৭ সালে আবার তা প্রকট হয়ে ওঠে ও সেই বছর ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়ে দুই দলের ভেতর একটা ছোট খাট খণ্ড যুদ্ধ হয়ে যায়, যার ফলে সে বারের কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত রাখবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর পর বামপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে ও ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত সেখানে দক্ষিণ পন্থীরা আনন্দে একাধিপত্য চালায়। দক্ষিণ পন্থীদের হাতে কংগ্রেস নীতির কোন

পরিবর্ত্তন হয় নি। ১৯০৯ সালে যখন মর্লি মিণ্টো শাসন সংস্কার অনুযায়ী ব্যবস্থাপক সভায় করদাতার সামান্য কিছু প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ ও বেশীর ভাগই পরোক্ষ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হল ও বড় লাটের কার্য্যকরী সভায় একজন ভারতীয়কে নেওয়া হবে স্থির হল, তখন তাই নিয়েই মডারেটরা বেশ খুসী হয়ে রইল।

কিন্তু দেশ তাতে খুসী হতে পারেনি। মহারাষ্ট্রের তিলক সম্পাদিত "কেশরী" ও বাংলায় শ্রী অরবিন্দ সম্পাদিত "বন্দেমাতরম" ও দেবব্রত, বারীণ, উপেন্দ্র প্রমুখ দেশসেবী পরিচালিত "যুগান্তর" শিক্ষিত জনসাধারণকে স্বাধীনতার অভিযানে প্রবুদ্ধ করতে লাগল। এর ফলে ও খানিকটা স্বাধীনতা কামী যুগযাত্রীর বিরুদ্ধে ইংরাজের দমননীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশে হিংসামূলক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এ হিংসার অভিযান গোড়াতে পাঞ্জাব বাংলা ও মহারাষ্ট্রে অভ্যুত্থিত হয়ে ক্রমশঃ সারা ভারতে ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ও সব সম্প্রদায় এর নেশায় বিভোর হয়ে ওঠে। গীতার কর্ম্মযোগকে আদর্শ করে বঙ্কিমের মাতৃমূর্ত্তির ছবি হৃদয়ে ধারণ করে কাতারে কাতারে যুবকবৃন্দ "বন্দেমাতরম" মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এল নিজ রক্তে দেশমাতৃকার আহুতি দিতে। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই হউক ইংরাজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করাই ছিল এদের ব্রত। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" ছিল এদের প্রতিজ্ঞা। পূর্ব্বাচলে জাপানের হাতে পরাক্রান্ত রুশিয়া ও আফ্রিকায় এবিসিনিয়ার কাছে বৃহৎ ইতালির পরাজয় এদের প্রেরণায় নূতন প্রাণ সঞ্চার করল। বাহুবলে যে পশ্চিমজাতি অজেয় এ ভ্রান্তি সবার মন থেকে ঘুচে গেল। বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র শস্ত্র আনা আরম্ভ হল ও দেশের ভেতর হাত-বোমা ইত্যাদি তৈরী করাও চলল। এ অভিযানের পূর্ণ বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি পরিশিষ্টে দেওয়া স্মরণীয়

ঘটনাবলীর ভেতর লিপিবদ্ধ করা হল। এ অভিযান আশানুরূপ [illegible] লাভ করতে পারেনি। দেশের জনসাধারণের এ অভিযানে খানিকটা সহানুভূতি থাকলেও তাদের এর ভেতর কোন যোগ ছিল না, তা ছাড়া অশান্তি ও বিপ্লবের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা আনবার জন্য দেশের জনসাধারণ তখনও প্রস্তুত হয় নি। ইংরাজের প্রধান অবলম্বন চাকুরে গোষ্ঠী, জমিদার ও ধনিক শ্রেণী এ অভিযানের বিরোধিতা করায় ইংরাজের পক্ষে এ আন্দোলন দমন করা খুব কঠিন হয়নি। এ অভিযানের মূল মন্ত্র ছিল ইংরাজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। স্বাধীনতার কোন পরিষ্কার ছবি, ও ইংরাজ রাজত্ব অপসারিত হলে কি ভাবে দেশ শাসিত হবে ও তাতে সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করা যাবে কিনা, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা এঁদের ছিল কি না সন্দেহ। স্বাধীনতা অভিযানে এই সব আত্মত্যাগী বীরের দান অতুলনীয়। দেশ মাতৃকার জন্য অবিচলিত চিত্তে রক্তদানের যে আদর্শ এরা রেখে গেছেন তা স্মরণ করেই মহাত্মাজীর অহিংস স্বেচ্ছাসেবক অকাতরে পুলিশের গুলির সামনে নিজের বুক এগিয়ে দিয়েছে, আজ আর তাই আবাল বৃদ্ধা বনিতা কেউই দেশের জন্য মরতে ভয় পায় না, স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের নেশা আজ তাই গোটা দেশটাকে এমনি করে পেয়ে বসেছে।

লোকমান্য তিলক কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ইণ্ডিয়ান হোম রুল পার্টি গঠন করেন, বাংলার শ্রী অরবিন্দ ও বিপিন পাল ও এ দলে যোগ দেন। এই দলের লক্ষ্য ছিল আয়রল্যাণ্ডের দাবী অনুযায়ী স্বরাষ্ট্রশাসন; ব্রিটিশ নৃপতির আনুগত্য স্বীকারে এঁদের আপত্তি ছিল না কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারত শাসনে কোন অধিকার এঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজ নীতি ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন শ্রী অরবিন্দকে ধরে রাখতে পারল না, আধ্যাত্মিকের অদৃশ্য টান তাঁকে নিয়ে গেল জনসাধারণের কোলাহল

থেকে অনেক দূরে। আলিপুর মামলা থেকে ছাড়া পাওয়ার অনতিপরেই তিনি পণ্ডিচেরী চলে যান ও তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত চলেছে তাঁর সাধনা, অতিচৈতন্য মানব অন্তরে বিকশিত করে নবজগতে স্বর্গের সৃষ্টি করা।

ভারতের মুসলমানেরা চট্ করে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত তারা নিজেদের আরবী ফারসীই চর্চ্চা করে গেছে, কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ , নবাব আবদুল লতিফ ও সৈদয় আমির আলী প্রমুখ নেতারা দেখলেন যে মুস্‌লিম জনসাধারণকে ইংরাজি শিক্ষা না দিলে আর গতি নাই; মুসলমানদের ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাই ১৮৭৫ সালে আলীগড়ে এংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ স্থাপিত হয় ও ১৯২০ সালে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

মুসলমানদের ভেতর কোন কোন নেতা কংগ্রেসে যোগ দিলেও অনেকেই এর বাইরে ছিলেন। তাঁরা প্রথমে এরূপ কোন সংঘের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেন নাই। ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ সংঘ বদ্ধ হওয়ার সার্থকতা বুঝতে পারে। তারা কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে ব্রিটিশ প্ররোচনায় ১৯০৬ সালে নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র লীগ গঠন করে। অবিশ্যি মুসলিম লীগের অনেক নেতাই তখন কংগ্রেসের ও সদস্য ছিলেন। দশ বছর পরে ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ নিজের সত্তা বজায় রেখে কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রিত হয়ে শাসন সংস্কারে জাতীয় দাবী চালাতে থাকে ও ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েই কাজ করে যায়। ১৯১৭ সালের কংগ্রেসে আবার বাম ও দক্ষিণ পন্থীদের ভেতর মিলন হয় ও তিলক প্রভৃতি বাম পন্থীরা, যাঁরা এতদিন কংগ্রেসের বাহিরে ছিলেন, তাঁরা আবার কংগ্রেসে পুনঃ প্রবেশ করলেন। মহম্মদ আলি জিন্না ১৯১৬ সালে

ছিলেন হোমরুলীগার, তিনিও তিলকের সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দেন, ও ১৯২১ সালের পর যখন গান্ধীর অসহযোগ নীতি কংগ্রেসের মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় ও জনগণের প্রতিপত্তি কংগ্রেসে বেড়ে যায়, তখন তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করে বিদেশে চলে যান ও কিছুদিন নিজেকে রাজনীতি থেকে মুক্ত করে রাখেন। তারপর ফিরে এসে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন ও আজ পর্য্যন্ত তার নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

* * * *

[ জাতীয় শিল্পের উদ্ভব : মর্লি মিন্টো শাসন সংস্কার : সম্রাটের দিল্লী দরবার ও বঙ্গ বিচ্ছেদ রদ : দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও ভারত রাজনীতি-ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া : প্রথম মহাযুদ্ধ ও ভারতের সহযোগিতা : ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার ও ভারতবাসীর নৈরাশ্য : রাউল্যাট আক্ট ও জালিওয়ানাবাগ : অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন : দেশবন্ধু ও স্বরাজ্যদল : শ্রমিক সংঘের উৎপত্তি : রাজনীতিক্ষেত্রে বিপর্যায় : ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে আত্মবিচ্ছেদ : সাইমন কমিশন ও ভারতবাসীর বিরোধিতা ]

কার্জ্জনের বঙ্গ বিচ্ছেদ পরোক্ষভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে একটা নতুন শক্তি দান করেছিল। যে বিদেশী বর্জ্জনের ধোঁয়া প্রথমে বাংলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে তা ক্রমশঃ সারা ভারতে ব্যাপ্ত হয়ে জাতীয়তাবাদীদের হাতে একটা অভিনব অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই বিদেশী বর্জ্জনের আশ্রয় নিয়েই দেশে গড়ে উঠ্‌তে লাগল দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য যা ছিল এতদিন বিদেশীর একচেটিয়া। সারা ভারতে একটা নতুন সাড়া

পড়ে গেল ও ১৯০৯ সালের মর্লি মিণ্টো শাসন সংস্কার সে উন্মদনা কিছু-মাত্র প্রশমিত করতে পারল না। কংগ্রেস মডারেট দলের হাতে রইল বটে, কিন্তু দেশ তাদের নায়কত্ব থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গেল। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ভারতে আসেন ও সে বছরের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে তাদের দরবার অনুষ্ঠিত হয়। এই দরবারে প্রায় ৮০,০০০ ভারতবাসী তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে সমবেত হয়েছিল। ব্রিটিশ সম্রাটের আনুগত্যে তখনও ভারতবাসীর আপত্তি ছিল না, পরন্তু তখন ভারতবাসী বিশ্বাস করত যে শাসক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়ার ঐ একমাত্র স্থান। দিল্লী দরবারে সম্রাটের ঘোষণায় বঙ্গবিচ্ছেদ রদ হয়ে গেল। ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লী সরিয়ে নেওয়া হল, বিহার উড়িষ্যা মিলে একটা স্বতন্ত্র নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হল ও আসামকে পুনর্ব্বার এক চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে পৃথক করা হল।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীর প্রতি তথাকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী ও শাসকমণ্ডলীর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কাহিনী দেশের জনসাধারণকে নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করে তোলে। ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসন যে ভারতীদের কল্যাণে নয় পরন্তু ইংরাজের জাতীয় দম্ভ ও শোসন নীতির পরিণতি সে সম্বন্ধে যা কিছু সন্দেহ ছিল তাও ঘুচে গেল। এই সময় হিন্দু ও মুসলমান জাতীয়তাবাদিরা একত্রে মিলে ইংরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ও ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের সভাপতি স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা ঘোষণা করেন যে তখন থেকে মুসলিমরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠায় যত্নবান

হবে। ১৯১৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগ একত্রে মিলে ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে একটি সম্মিলিত দাবী প্রস্তুত করে। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট ইতিমধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ঢুকে পড়েছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন ও ১৯১৬ সালে তিনি একটি হোম রুল লীগ গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল লোকমান্য তিলক সংগঠিত লীগের সঙ্গে মিলে ভারতের শাসন সংস্কার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ভারত নির্ব্বিবাদে ইংরাজকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ইংরাজ অবিশ্যি ভারতবাসীকে কখনই বিশ্বাস করেনি ও তাদের এ আশঙ্কাও ছিল যে ইংরাজের বিপদের অবকাশ নিয়ে ভারতে বিদ্রোহের সূচনা হতে পারে। তারা গোপনে তাদের পূর্ব্বাচলের মিত্র নিপ্পণের সঙ্গে ব্যবস্থাও করেছিল যে প্রয়োজন হলে তারা এসে ভারত দখল করবে ও কোন বিদ্রোহের সাড়া পেলে তাকে সমূলে উৎখাত করে ফেল্‌বে। মহাত্মা গান্ধী ততদিনে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছিলেন। ইংর্‌াজের বিবেকবুদ্ধির উপর তখনও তিনি আস্থা হারান নাই। যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য করতে যে সব ভারতীয় ইংরাজের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তন্মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য মিত্রশক্তি সে যুদ্ধে নেমেছিল এ কথা তারা বড় গলায় অনেক বার বলেছে, সে কথা ভারতবাসী তখনও অবিশ্বাস করেনি ও অবিশ্বাস করেনি বলেই এই আশা নিয়ে রক্তদান করে গেছে যে যুদ্ধান্তে ভারতবাসী তাদের ন্যায্য অধিকার 'স্বরাজ' হতে বঞ্চিত হবে না। তুর্কী ইংরাজের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করায় অবিশ্যি মুসলমানদের ভেতর খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু ইংরাজের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে তারা সেজন্য

বিরত করেনি। যুদ্ধের শেষের ভাগে যখন মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠল তখন ভারতবর্ষে খুব একটা অসহিষ্ণুতার সাড়া পড়ে যায়। ভারত সচীব মন্টেগু সে সময় ভারত পরিদর্শনে আসেন ও তখনকার রাজ প্রতিনিধি লর্ড চেল্মস্‌ফোর্ডকে নিয়ে সমস্ত দিক পর্য্যালোচনা করে শাসন সংস্কার সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই ১৯১৯ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন পাশ হয় যাতে করে প্রদেশের কোন কোন জাতিগঠন বিভাগের যথা স্বাস্থ্য, ভারতীদের শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ইত্যাদির শাসন ভার কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের আধিপত্য হতে মুক্ত করে তা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীবর্গের হাতে অর্পণ করা হয়। এ শাসন সংস্কার মডারেট দলের মনোনীত হলেও কংগ্রেস একে গ্রহণ করল না। ফলে মডারেটরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে ন্যাসান্যাল লিবারেল ফেডারেশন ( National Liberal Federation ) নামক একটি সংঘ গঠন করল ও এই সংস্কার অনুযায়ী কাজ করতে বদ্ধপরিকর হল। মডারেট দলের অন্যতম নেতা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য অবিশ্যি কংগ্রেস ত্যাগ করলেন না ও কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মেনে নিতে প্রস্তুত রইলেন।

১৯১৯ সালে রাউল্যাট অ্যাক্ট ( Rowlatt Act ) পাশ হয়। সে আইন আমলাবর্গকে বিনাবিচারে যে কোন নরনারীকে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দী করে রাখবার ছাড় পত্র দেয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় এত বড় হস্তক্ষেপ সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। প্রবুদ্ধ ভারত একে নির্ব্বিবাদে মানতে পারলনা ও এর বিরুদ্ধে দেশবাসী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করল। ততদিনে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হওয়ায় ইংরাজের ভারতবাসীকে নিবৃত্ত রাখার প্রয়োজন ও ফুরিয়েছিল, তাই দুর্দ্দান্ত ব্রিটিশ সিংহ তার নখ ও দন্ত নিয়ে ছুটে এল ভারতবাসীর ওপর। ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে ব্রিটিশ

বীর কেশরী জেনারেল ডায়ার জালিওয়ানাবাগে নিরীহ ও নিরস্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতার ওপর যে হত্যার তাণ্ডব লীলার অভিনয় করলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার জোড়া নেই। বর্ব্বরতা হিসাবে আয়রল্যাণ্ডের ব্লাক ও ট্যানের অত্যাচার তার কাছে নিষ্প্রভ। এই সব অমানুষিক অত্যাচারে ও শান্তি সম্মেলনে তুর্কীর সন্ধিসর্ত্ত খুব অপমানজনক হওয়ায় সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে দেশবাসীর তিক্ততা একান্ত প্রকট হয়ে ওঠে, যদিও চাকুরে গোষ্ঠি, সৈন্যবিভাগ, তথাকথিত স্বাধীন নৃপতি বৃন্দ ও অভিজাত বংশীয় ধনিক সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থের জন্য তখনও সাম্রাজ্যবাদীর পৃষ্ঠপোষকই রয়ে গেল। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ তাদের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারল না।

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাব পাশ হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে খিলাফৎ আন্দোলন চালাতে লাগলেন, উভয়েরই লক্ষ্য ছিল ইংরাজের ভারত শাসন অসম্ভব করে তোলা। খিলাফৎ আন্দোলনের ভেতর খলিফাকে তাঁর ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবার দাবীও ছিল। ১৯২২ সালের পর খিলাফৎ আন্দোলনের কিছু রইল না কারণ খলিফার অস্তিত্বই ততদিনে লুপ্ত হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর অভিনব পরিকল্পনা। সত্যের উপাসক ঋষি তিনি, তাঁর আদর্শ যেন তেন প্রাকারেণ' স্বাধীনতা অর্জ্জন নয়। অসহযোগ আন্দোলন চালাতে হলে প্রথমে অহিংস হতে হবে, কায়মনোবাক্যে। সরকারী লাঠি ও গুলি হাসিমুখে বরণ করতে হবে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সঞ্চালন না করে। ব্যক্তিগত ভাবে ইংরাজ আমাদের শত্রু নয়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্রোধ নেই, আমাদের অভিযোগ তাদের শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে ও তার বিরুদ্ধেই আমাদের অহিংস সংগ্রাম

চালাতে হবে, এ শিক্ষা প্রথম তিনিই ভারতবাসীকে দেন ও কংগ্রেস তা অবনতমস্তকে মেনে নেয়। কংগ্রেসের পরিধি বিস্তার করে জনগণকে এর ভেতর টেনে আনা একমাত্র তাঁরই চেষ্টার ফল। শুদ্ধমাত্র শিক্ষিত সমাজকে নিয়ে আন্দোলন করে স্বরাজ লাভ করা সম্ভব নয়, সকলকে এর ভেতর টেনে এনে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় তা অর্জ্জন করতে হবে ভারতবাসীকে তিনিই প্রথম এ শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনিই এ চেতনা ভারতবাসীর অন্তরে প্রবুদ্ধ করেছেন যে তাদের সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্রচালনা' অসম্ভব, রাষ্ট্রের উৎপাত চাইলে প্রথমে সে সহযোগ বর্জ্জন করার শক্তি অর্জ্জন করা চাই। শক্তি অর্জ্জনের প্রধান উপায় অন্ন বস্ত্র বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী না হওয়া আর তা হতে হলে অপবিত্র জ্ঞানে বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করতে হবে ও চরকা দিয়ে সুতা কেটে খদ্দর তৈয়ারি করতে হবে। বস্তুতঃ চরকা ও খদ্দর প্রচলন ছিল গান্ধী অসহযোগবাদের মূলমন্ত্র।

১৯২৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ আন্দোলন খুব জোর ভাবেই চল্‌তে থাকে। ১৯২৩ সালের শেষ সপ্তাহে গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও এন্, সি, কেলকারকে নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরেই একটি স্বরাজ্য দল গঠন করেন। কংগ্রেসের ব্যবস্থা সভা বর্জ্জন নীতি স্বরাজ্যদল আর সমর্থন করতে পারল না। তারা চাইল জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে ঢুক্‌তে, অবিশ্যি ১৯১৯ সালের শাসন পদ্ধতিকে মেনে নিতে নয়, সেখানে ঢুকে বাইরে ও ভেতরে একসঙ্গে সংগ্রাম চালাতে যাতে অচিরেই সেই শাসন পদ্ধতির অবসান ঘটে ও তার জারিজুরি দেশবাসী ও জগতের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেশবন্ধু যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন স্বরাজ্য দল জাতীয় আন্দোলনে সব চেয়ে বড় শক্তি ছিল, কিন্তু ১৯২৫ সালে তাঁর আকস্মিক তিরোধানের পর সে শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

প্রথম যুদ্ধের অনতিপরেই দেশে খাদ্যসামগ্রীর দাম খুব বেড়ে যায় কিন্তু শ্রমিকের ব্যক্তিগত আয় বাড়ল না। ততদিনে দেশের নবচেতনা এসেছিল। এ চেতনার ধারা শ্রমিক শ্রেণীকে ও কিছু কিছু স্পর্শ করে। তাই ১৯১৮ সালে বি, পি, ওডিয়া মাদ্রাজে প্রথম শ্রমিকসংঘ গঠন করতে সক্ষম হন। শ্রমিকেরা ক্রমেই এরূপ সংঘের প্রয়োজনীয়তা ও নিজেদের ন্যায্য অধিকার অর্জ্জনে ধর্ম্মঘটের কার্য্যকারিতা বুঝতে পারল। ধর্ম্মঘটের সাফল্যের জন্য দেশব্যাপী মজুরদের এক হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তা তাদের বুঝতে দেরী হল না। তাই শ্রমিকদের চাহিদানুযায়ীই নারায়ণ মহলার যোশী ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে নিখিল ভারত শ্রমিক সংঘ ( All India Trade Union Congress ) গঠন করতে সমর্থ হলেন। এই সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রদেশে প্রদেশে কেন্দ্রীয় সংঘ গড়ে উঠল ও তারই জোরে অনেক ধর্ম্মঘটও হতে থাকল ও শ্রমিকদের দু'একটা দাবী কারখানার মালিকেরা মানতে বাধ্য হল। ১৯২৯ সালে কম্যুনিষ্ট দল এ সংঘ দখল করার চেষ্টা করায় এর ভেতর একটা ভাগ হয়ে যায় ও এন্ এম্, যোশী ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশন ( Indian Trade Union Federation ) নামে আর একটি নতুন সংঘ গঠন করেন। ১৯৩১ সালে ঐ কংগ্রেসে আবার ভাঙ্গন ধরে। গত কয়েকবছর ধরে ভারতের বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের মিলনের প্রচেষ্টায় একটি যুক্ত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়েছে। এর সভ্য সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ ও এর ভেতর সংযুক্ত আছে প্রায় দুই শত ইউনিয়ন। স্বাধীনতা অভিযানে শ্রমিকের জাগরণ দেশের একটা প্রচণ্ড শক্তি। সে দিন আর নাই যখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আন্দোলন ছিল সম্রাজ্যবাদীর একমাত্র চিন্তার কারণ, আজ জনগণের বিক্ষোভ তাকে সত্যিকারের উদ্বিগ্ন ও নিদ্রাহীন অবস্থায় এনে ফেলেছে।

১৯২৬ সালে লর্ড আরুইন ( বর্ত্তমানে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ) ভারত শাসন ভার গ্রহণ করেন। এর অনতিপরেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন মতবাদের জন্য রীতিমত বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়। হিন্দু মুসলমানের যে মিলন এতদিন স্বাধীনতার অভিযানকে দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে দিচ্ছিল, তাতেও একটা ভাঙ্গন ধরল। এই সময় আর্য্যসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কোন এক অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসী মুসলমান আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় গভর্ণমেণ্ট তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করার মানসে পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে ও মীরাটে সে দলের নেতৃবর্গকে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত করে মস্তবড় একটা বিচার অভিনয় আরম্ভ করে। স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট টাকার হার এক সিলিং ছয় পেন্স নির্দ্ধারিত করায় দেশময় একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদের সাড়াও পড়ে যায়। হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্যের ফলে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সভ্যগণ গভর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে ঝুঁকে পড়ে ও যেন হিন্দুদের জব্দ করার জন্যই তারা প্রতি প্রস্তাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভোট দিতে থাকে। যদিও কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের সংঘ বলেই চিরকাল দাবী করে এসেছে কিন্তু মুসলীমলীগ আজ পর্য্যন্ত তাকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু বলে স্বীকার করে না। মুসলীমলীগের কার্য্যপ্রণালী অনেকের কাছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কুটনীতির সহায়ক বলে মনে হয়। কিন্তু তার ভেতর আছে সেই মনোভাব, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের তিক্ততার প্রকাশ। মুসলমানেরাও দেশের স্বাধীনতা চায়, কিন্তু তারা আশঙ্কা করে যে এখন দেশে স্বাধীনতা এলে তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের তাঁবে এসে পড়বে। এই হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিরোধিতাই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার কথা। আজ সে রাজত্বের সায়াহ্নে

আবার সেই বিবোধিতা নগ্ন মূর্ত্তি ধারণ করেছে। হিন্দুরা প্রথমে সাম্রাজ্য গঠনে ইংরাজকে সাহায্য করেছিল, তাই প্রকৃতির প্রতিশোধ হিসাবে মুসলমানের সন্দেহই আজ স্বাধীনতার পথে সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯২৭ সালে ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দাখিল করবার জন্য স্যার জন্ ( বর্ত্তমানে লর্ড ) সাইমনের অধিনায়কত্বে পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনে কোন ভারতীয়দের স্থান না থাকাতে দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয় ও কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করে যে তারা একে বয়কট্ করবে ও এর সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব রাখ্‌বে না। সাইমন্ কমিশন ভারতে আসার পর বহু স্থানে তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করাও হয়েছিল। লাহোরে এ বিক্ষোভকারীদের নেতা ছিলেন স্বয়ং লালা লাজপৎ রায়। কৃষ্ণপতাকা হাতে বিক্ষোভকারীরা সম্পূর্ণ অহিংস থাকা সত্ত্বেও পুলিস তাদের ওপর যথেচ্ছ লাঠি চালায় ও লালাজী সন্ডারস্ নামক পুলিস কর্ম্মচারীর হাতে আহত হন। বস্তুতঃ এই আঘাতই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ। জাতীয় জীবনে মহাত্মাজীর অহিংস নীতির প্রভাবের জন্য হিংসা অবলম্বী যুববৃন্দ জাতীয় আন্দোলনে বড় একটা স্থান করে নিতে না পারলেও তারা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। লালাজীর মৃত্যুর প্রতিশোধ তারাই নিল, কিন্তু কংগ্রেস সে প্রতিহিংসা সমর্থন করেনি।

১৯২৯ সালে কংগ্রেস ঘোষণা করল যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য পূর্ণ-স্বাধীনতা। যে সংকল্প বাক্য কংগ্রেস শেষ পর্য্যন্ত এই পূর্ণ স্বাধীনতা বিষয়ে গ্রহণ করেছে তার আংশিক বাংলা অনুবাদ এইরূপ।

"আমরা বিশ্বাস করি যে অনান্য জাতির ন্যায় ভারতীয় জনগণেরও স্বাধীনতা অর্জ্জনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে তাদের শ্রমলব্ধ বিত্তের ফল ভোগের এবং আত্মবিকাশের উপযোগী পূর্ণ সুযোগ লাভের জন্য জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহারেরও অধিকার আছে।

আমরা এও বিশ্বাস করি যে যদি কোন গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে এই সমস্ত অধিকার হতে বঞ্চিত করে ও তাদের ওপর উৎপীড়ন চালায় তা হলে তাদের সে গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন বা বিলোপ সাধনেরও অধিকার আছে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শুধু যে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা হরণ করেছে তাই নয়, তারা জনগণের শোষণের ভিত্তির ওপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক হতেও ধ্বংশ করেছে।

তাই আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষকে অবশ্যই ইংরাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করতে হবে।

আমরা স্বীকার করি যে আমাদের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে হিংসাত্মক উপায় সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ উপায় নয়। শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায় অবলম্বন করে ভারতবর্ষ শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছে ও স্বরাজ লাভের পথে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে ও এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করেই আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করবে।

আমরা ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি ও পূর্ণ স্বরাজ অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে আমরা যথারীতি সংকল্প গ্রহণ করছি। ইত্যাদি ইত্যাদি''

[ নেহেরু রিপোর্ট ও ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগ : আরুইন ঘোষণা : আইন অমান্য আন্দোলন ও প্রথম গোল টেবিল বৈঠক—গান্ধী আরুইন চুক্তি : দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য : কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রবাদী দল ]

ভারতের জনমত উপেক্ষা করে সাইমন কমিশন তাদের কাজ চালিয়ে গেল, বেশীর ভাগ ভারতবাসীই তাদের কার্য্যাবলীর প্রতি কোন উৎসাহ প্রকাশ করল না। ১৯২৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর চেষ্টায় দিল্লীতে ভারতের সকল দলের একটি সম্মেলন হয়। তার ফলে মতিলাল নেহরুর অধিনায়কত্বে একটি কমিটি গঠন হয় যার কাজ ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সম্পর্কে এরূপ পরিকল্পনা করা যাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই সমর্থন আছে। বাংলার সুভাষচন্দ্র এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। এই কমিটির রিপোর্ট ( যা নেহরু রিপোর্ট নামে খ্যাত ) সেই বছরই বের হয় ও ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় আহূত কংগ্রেস ও অল্ পার্টিস কন্‌ভেনসনে ( All Parties Convention ) আলোচিত হয়। ইতিমধ্যে নবেম্বর মাসে কংগ্রেসের ভেতরই শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের সভাপতিত্বে ও সুভাষ চন্দ্র ও জহরলাল নেহরুর সম্পাদনায় স্বাধীনতা সংঘের ( Independence League ) পত্তন হয়েছিল। সে সংঘ ঘোষণা করে যে ভারতের লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন নয়। নেহরু কমিটি অবিশ্যি ভারতের শাসন সংস্কারে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব আনে ও সেই প্রস্তাব যখন ডিসেম্বরের কংগ্রেসে উপস্থিত হয় তখন প্রগতিশীল দলের বিরোধিতা সে সভায় স্বতঃই মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। দুই দলের এই বিতণ্ডার ভেতর এলেন স্বয়ং মহাত্মাজী, তাঁর সুপারিশে কংগ্রেস স্থির করল যে যদিও পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের চরম লক্ষ্য তবু ইংরাজ যদি ১৯২৯

সালের ভেতর ঔপনিবেশিক স্বাযত্বশাসন দান করে তবে কংগ্রেস তা গ্রহণ করবে।

১৯২৯ সালে ৩১শে অক্টোবর লর্ড আরুইন্ একটি ঘোষণায় বলেন যে ভারতের শাসন সংস্কারের চরম লক্ষ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন ও সাইমন কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করলে ভারতের নতুন শাসন পদ্ধতি প্রস্তুত করার জন্য লণ্ডনে একটি গোল টেবিল বৈঠক আহূত হবে। এই ঘোষণা ভারতবাসীকে তেমন আশান্বিত করতে পারেনি কারণ আরুইনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে এই স্বায়ত্ব শাসনের নানারূপ ব্যাখ্যা দেওযা আরম্ভ হয়।

১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেস আবার তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করে ও অভিমত প্রকাশ করে যে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানে কোন ফল হবে না। ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল মহাত্মাজী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। লবণ আইন ( Salt Act ) ভঙ্গ করণে ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ডাণ্ডী যাত্রা ( Dundee March ) এখন ও ভারতবাসীর মানসপটে জ্বলন্ত স্মৃতি। এই সময়ের সর্ব্বপ্রধান স্মরণীয় ঘটনা ভারত ললনার অপূর্ব্ব জাগরণ ও এই আইন অমান্য আন্দোলনে ছোট বড় নির্ব্বিশেষে যোগদান। মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগই এই আন্দোলনের বাইরে থাকে। অর্ডিনেন্সের পর অর্ডিনেন্স জারী হতে থাকল, মহাত্মা প্রমুখ জননেতা সকলেই কারারুদ্ধ হলেন ও সেই দমন নীতির যবনিকার পিছনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক ১৯৩০ সালের নবেম্বর মাসে লণ্ডনে তথাকথিত ভারতের নেতৃবর্গকে নিয়ে ভবিষ্যৎ ভারত শাসন পদ্ধতি আলোচনা করবার জন্য সমবেত হল। কংগ্রেসের প্রতিনিধির অভাবে সে সভা জম্‌ল না ও তখনকার প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ঠিক করলেন যে আবার দ্বিতীয়

বৈঠক আহ্বান করা হবে ও তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি যাতে আসেন সে চেষ্টাও করতে হবে। ১৯৩১ সালের ২৫শে জানুয়ারীতে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির অন্যান্য সভ্যাদিগকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হয়। রাজপ্রতিনিধির আমন্ত্রণে মহাত্মাজী লর্ড আরুইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আপোষ মীমাংসা সম্বন্ধে একটা আলোচনা চলে। ফলে ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ্চ উভয়ের মধ্যে একট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, য গান্ধী আরুইন প্যাক্ট নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এই সর্ত্তানুসারী কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিল, গভর্ণমেণ্ট ও তাদের প্রবর্ত্তিত সমস্ত অর্ডিনান্স বাতিল করল ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিল। স্থির হল যে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক বসে ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর হতে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। এই বৈঠকও সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডার জন্য আশানুরূপ কিছু করতে পারল না। ইতিমধ্যে আরুইনের জায়গায় উইলিংডন্ ভারতের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। গান্ধী আরুইনের চুক্তির সর্ত্ত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকেই প্রথম অমান্য করায় সীমান্ত প্রদেশে অব্দুল গফুর খাঁ আবার আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করলেন। ফলে গভর্ণমেণ্টের দমননীতি দ্বিগুণ ভাবে চল্‌ল ও মহাত্মাজীর প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই কংগ্রেসের অনেক নেতা কারাগারে স্থান পেলেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের তিন সপ্তাহের ভেতর মহাত্মাজীও তার শিষ্যদের পথ অনুসরণ করে ব্রিটিশ কারাগারে প্রবেশ করলেন।

১৯৩৪ সালে জাতীয় আন্দোলন গভর্ণমেণ্টের দমননীতির দ্বারা তখনকার মত প্রশমিত হয়। বামপন্থীদলের প্রভাব দেশে একটু বাড়্‌তে থাকে ও কংগ্রেসের ভেতর স্যোসালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট পার্টি নিজেদের

খানিকটা প্রতিষ্ঠিত করে। উভয় দলের মূল মন্ত্রই সমাজতন্ত্রবাদ, কিন্তু স্যোসালিষ্ট পার্টি জাতীয়তাবাদ সর্ব্বদাই তাদের আদর্শের সম্মুখে ধরে রেখেছে বলে ভারতের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা থেকে তারা কখনই লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টি অবিশ্যি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে জাতীয় আকাশে ধূমকেতুর মত দেখা দিয়েছে, তার প্রধান কারণ যে জাতীয়তাবাদ তারা বিশ্বাস করে না, আর তাদের নীতি একমাত্র তাদের হাতে নয়, সেটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ থার্ড ইণ্টারন্যাশান্যালের কার্য্যকরী সমিতির ওপর। তাই গত মহাযুদ্ধে রুশিয়া যতদিন সে মহা আহব থেকে দূরে ছিল ততদিন এই দলই ইংরাজের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ বলে ঘোষণা করে আবার হঠাৎ তাকেই ১৯০১ সাল থেকে জন যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে তার চরণে সর্ব্বস্ব বলি দিয়েছিল। ১৯৪২ সালের জাতীয় আন্দোলন রুশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পরোক্ষ ভাবে বাধা সৃষ্টি করবে মনে করে এরা সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করতেও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় নাই। যখন ১৯৪৩ সালে খাদ্যের অভাবে দেশে দারুণ মন্বন্তরের সৃষ্টি হয় তখন এই দলই ডিনায়েল পলিসির খাতিরে পূর্ব্ববঙ্গে গভর্ণমেণ্টের হাতে মজুত খাদ্যশস্য নষ্ট করার সমর্থন করতে একটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। ১৯১৭ সালে রুশিয়ায় সোভিয়েট শাসন স্থাপিত হবার পর হতেই এদের মতে জগতের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে, এর পূর্ব্বে যে বিশ্বজগতের কোন সৃষ্টি হয়েছিল, এর আগে যে এ জগতে যুগ যুগ ধরে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তা এদের তথাকথিত বিজ্ঞেরা (Wiseacres) স্বীকার করে না; এদের ভাষা জনসাধারণের দুর্ব্বোধ্য, ভারতের বিপ্লবের পথে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করাই যেন এদের একমাত্র কাম্য। তাই যতদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে এরা কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বিরোধিতায় প্রয়োগ করতে পারবে বলে মনে করেছিল ততদিন তাঁকে পূজা করেছে, কিন্তু সেই

নেতাজীই যখন মালয়ে আজাদ হিন্দ সৈন্য গঠন করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা নতুন ইতিহাস গড়ে তুললেন তখন এরা সেই নেতাজীকে কুইসলিং আখ্যা দিয়ে তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি আগুনে পোড়াবার প্রহসন করতে কিছু মাত্র বিচলিত হয় নি। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতির পেছনে রুশিয়ার কতটা সহানুভূতি আছে জানা নাই, কিন্তু আপতঃদৃষ্টিতে এ দলকে সুবিধাবাদী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। শ্রমিকের ভেতর ও যে এদের পৃষ্ঠপোষক খুব কম, গত নির্ব্বাচনেই তার প্রমাণ হয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রবাদ যে এখন ভারতের নতুন শাসন পদ্ধতির একমাত্র মূলনীতি হবে সে কথা কংগ্রেস কেন, কেউই আজ আর অস্বীকার করে না। যে কংগ্রেস অভিজাত বংশীয় কয়েকজন নেতার দ্বারা আরব্ধ হয়েছিল, অর্দ্ধশতাব্দীর চেষ্টার ফলে তা এখন জনগণের সামগ্রী। কংগ্রেস চিরকালই ঘোষণা করে এসেছে যে জনমাত্রই তাদের শ্রমলব্ধ ন্যায্য ফল লাভের অধিকারী ও শাসন পদ্ধতি এমনি ভাবে গড়ে তুল্‌তে হবে যাতে করে প্রত্যেকে তার ন্যায্য অধিকার পেয়ে আত্মবিকাশের উপযোগী পূর্ণ সুযোগ লাভ করতে পারে। নতুন সমাজ পুনরায় গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা মহাত্মাজীর পরিকল্পনা। সহর-বাণিজ্য সভ্যতার মূলমন্ত্র হলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে সমাজের চাপে মিলিয়ে যায় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তা অনুধাব্য। বস্তুতন্ত্রবাদী জগৎ আজ ধন সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন, মানুষের প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তার দিকে তার লক্ষ্য নাই, সেই ধন সম্পদের মালিকানাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বর্ত্তমান সম্প্রদায় ও সমাজে পরস্পরের ভেতর তীব্র ভেদাভেদ, যার ফলে গত পঁচিশ বছরের ভেতর হয়ে গেল দু'দুটা বিশ্ব সংগ্রাম, বিপ্লব ও রক্তপাতের ত কথাই নাই। কম্যুনিষ্টরা হয়ত বল্‌বে যে সহর ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে সভ্যতা না গড়ে তুল্‌লে সর্ব্বহারাদের একত্রিত হবার সুযোগ হবে না ও

তারা কখনই সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হতে পারবে না, ফলে অভিজাত শ্রেণীর প্রতিপত্তি সমাজে থেকেই যাবে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যাদের সামান্য জ্ঞান আছে তারা কখনও একথা বলবে না। সর্ব্বহারার সৃষ্টি যে উনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্র ও শিল্প বিপ্লবের ফল তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। যাতে করে শ্রেণীবিশেষকে সর্ব্বহারার পর্য্যায়ে আনা হয়েছে তার ভেতরই অবিশ্যি ছিল তাদের শক্তি সংগ্রহের বীজ। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শক্তি সংগ্রহ করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলেই সমাজে এদের সৃষ্টি করার কোন মানে হয় না। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ইতিহাসের শিক্ষা হতে নিজ কর্ত্তব্য বুঝে নেওয়া উচিত, নইলে পশ্চিমের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কোন কালেই দেশকে এগিয়ে দেবে না। আজ দু শতাব্দীর ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলা যায় যে বিকেন্দ্রীভূত শাসনই একমাত্র ভারতে শক্তি ও স্বাধীনতা আনতে সক্ষম, কেন্দ্রীয় শাসনে ব্যক্তিত্বের কোন স্থান নাই। এখন ও ভারতের অনেক গ্রামে এমন লোকের অভাব হবে না যারা ব্রিটিশ রাজদণ্ডের ছোঁয়া অনুভব করে না, যারা নিজেদের বাগ্ বিতণ্ডা পঞ্চায়েতের হাতে মীমাংসার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি যদি একমাত্র পশ্চিম জগতের দিকে না তাকিয়ে তাদের নিজেদের প্রাচীন সমাজ পরিকল্পনার ইতিহাস থেকে দু'একটা পৃষ্ঠা উল্টে দেখে তবে তাদের চেতনা এখন ও ফিরে আসা আশার বাইরে নয়। একথাও তাদের না জানবার নয় যে রুশিয়ায় বর্ত্তমানে গড়ে উঠেছে তিনটি বিশিষ্ট শ্রেণী যথা শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী ( Entelligentsia ) ও এ শ্রেণীবিভাগ ষ্টালিন দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলেই মনে করেন। এ শ্রেণীবিভাগ প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমের অনুরূপ কিনা একথাটা কি তাদের মাথায় একবার ও এসেছে ?

[ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ : রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ও গান্ধী পন্থীর বিতণ্ডা : ফরওয়ার্ড ব্লকের উৎপত্তি : যুদ্ধারম্ভে সুভাষচন্দ্র, কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মহাত্মাজী : ব্যক্তিগত আইন অমান্য : লিংলিথগাওএর ঘোষণা : যুদ্ধ ও মুসলিম লীগ : কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক নীতি ও সহযোগ প্রস্তাব : অ্যাটলাণ্টিক চারটার ও ভারতের প্রতিক্রিয়া : সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান : অতর্কিতে জার্ম্মাণীর রুশিয়া আক্রমণে ভারতের প্রতিক্রিয়া : ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের অবস্থা ও ক্রীপসের আগমন ]

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনাকে মূল করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন গঠিত ও প্রবর্ত্তিত হয়। এই শাসন তন্ত্রে দুইটি প্রধান বিষয় ছিল, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ( Provincial Autonomy ) প্রবর্ত্তন ও কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের ( Central Federation ) পরিকল্পনা। ভারতের নৃপতি বর্গ ও জনসাধারণের প্রতিবোধের ফলে কেন্দ্রে এই আইন আজ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নি ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে তার জন্য কখন ও উদ্বাস্ত হতে ও দেখা যায় নি। এ আইনানুযায়ী প্রদেশকে অবিশ্যি কেন্দ্রীয় শাসন থেকে অনেকটা মুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু সত্যিকারের ক্ষমতা যে নির্ব্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে না দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ গভর্ণরের হাতে বিগত মহাযুদ্ধের সময়ই তার যথেষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে। ১৯৩৭ সালে ভারতে এই শাসন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয় কিন্তু কংগ্রেস গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা মন্ত্রীদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করবে বলে ব্যবস্থা সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও শাসনভার গ্রহণে অসম্মত হয়। ফলে অধিকাংশ প্রদেশেই শাসনভার গভর্ণর নিজ হাতে নিয়ে ব্যবস্থাপক সভা স্থগিত রাখলেন। দু একটি প্রদেশে মিলিত ( Coalition ) মন্ত্রীশাসন সংস্থাপিত হল মাত্র।

১৯৩৭ সালে নতুন গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিংলিথগাও ঘোষণা করে কংগ্রেসকে আশ্বাস দিলেন যে প্রাদেশিক গভর্ণর মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজে সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করবেন না ও মোটামুটি প্রজাতান্ত্রিক নৃপতির স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে যাবেন। ফলে ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে ও অন্য তিনটিতে কোয়ালিশনে যোগ দেয়।

তারপর এল ১৯৩৯ সালে ইউরোপের মহাসমর। দেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর বা কোন রাষ্ট্রীয় দলের কোন পরামর্শ না নিয়েই বড়লাট ভারতবর্ষকে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামালেন। প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস সমস্ত প্রদেশের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করল। নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট বাদ যে জগতের পক্ষে অকল্যাণকর ও স্বাধীনতাকামী জনমাত্রেরই যে তাদের প্রতিরোধ করা উচিত সে বিষয়ে কংগ্রেসের ও মতভেদ ছিলনা, কিন্তু ইংলণ্ডের যুদ্ধকে নিজের যুদ্ধ করবার পূর্ব্বে কংগ্রেস জানতে চাইল যে কি আদর্শ নিয়ে ইংলণ্ড এ যুদ্ধে ব্রতী হয়েছে। এ যুদ্ধ যদি দুইটি পরাক্রান্ত দলের ভেতর পৃথিবীর আধিপত্য লাভের প্রয়াসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে থাকে তবে তার ভেতর ভারতের কোন স্থান নাই। ইংরাজের ওপর ভারতবাসীর আস্থা অনেক আগেই লোপ পেয়েছিল। যে ইংরাজ অল্পদিন আগেই স্পেনের প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের তলায় কৌশলে ছিদ্র করে দিয়ে দূর হতে তামাসা দেখেছে, যারা বিগত কয়েক বছর ধরে জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জীবন মরণ সংগ্রামে একটুকুও সহানুভূতি দেখায় নি যারা মুসলিনির অ্যাবিসিনিয়া ও অ্যালবানিয়া গ্রাস নির্ব্বিবাদে হজম করে গেছে ও এই সেদিন নিজহাতে রুশিয়াকে অগ্রাহ্য করে অন্যান্য মহাজাতির সঙ্গে মিলে চেকোশ্লোভেকিয়াকে হিট্‌লারের হাতে তুলে দিয়ে এসেচে, যে আজও ভারতে তার সাম্রাজ্যবাদ তেমনি তীব্র ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে,

তাব সংগ্রাম জগতের স্বাধীনতার জন্য, এই উক্তির আন্তরিকতায় বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য। সত্যি যদি ইংরাজের চেতনা ফিরে এসে থাকে তবে তাদেব কর্ত্তব্য অচিরে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা কবা, তাহলেই ভাবত নির্ব্বিবাদে তাকে যুদ্ধে সাহায্য করবে।

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেসের গান্ধীপন্থীদের আন্তর্জাতিক নীতি নিয়ে দারুণ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৩৯ সালে তারা সুভাষচন্দ্রের পুনঃ রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচনের প্রতিকূলে দাঁড়ায়। তাদেব বাধা অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাচনে জয় লাভ করলেন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি সর্ব্বদলেব কার্য্যকরী সমিতি কংগ্রেসের ভেতর গঠন করতে সমর্থ হলেন না। এ বিষয়ে মহাত্মাজীর সাহায্য ভিক্ষা করেও যখন তিনি বিফল মনোবথ হলেম তখন সভাপতিত্ব ত্যাগ করে কংগ্রেসেব বাইরে তিনি তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লক সৃষ্টি কবলেন ও প্রত্যক্ষ ভাবে তখনকার কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা ও তার বিরোধিতা আবম্ভ করলেন! এর ফলে কংগ্রেস তার অতীত রাষ্ট্রপতিব যে দণ্ডাজ্ঞা বিধান করেছিল তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, নীতি ও ধর্ম্মের দিক দিয়ে তা ঠিক হয়েছিল কিনা ভবিষ্যৎ দেশবাসী তার বিচার করবে। তবে মহাত্মা গান্ধী, যিনি তখন নিজ হাতে তাঁব বিচারের রায় মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন, তিনিই ১৯৪৭ সালেব স্বাধীনতা দিবসে সুভাষচন্দ্রকে ভারত-স্বাধীনতা অভিযানেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বলে তাঁরই উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

যুদ্ধারম্ভের অনতি পরেই সুভাষচন্দ্র ও কম্যুনিষ্ট দলের নেতারা এ যুদ্ধের অবকাশে ইংরাজের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সুপারিশ করেন, কিন্তু কংগ্রেস তখন তা মেনে নেয় নি। দুর্ব্বল শক্তিকে অতর্কিতে আঘাত করা চিরকালই . মহাত্মাজীর

নীতির বিরোধী, তাই তিনি এ সময় জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করলেন না। সুভাষচন্দ্র ক্ষোভে, নিষ্ফলতায় দেশ ছেড়ে গোপনে বাইরে পালিয়ে গেলেন, বাইরে থেকে যদি তিনি এ সময় দেশের স্বাধীনতার জন্য কিছু করতে পারেন এই আশায়। কম্যুনিষ্টদের নিজেদের করবার কিছু ক্ষমতা ছিলনা একমাত্র কংগ্রেসকে গাল দেওয়া ছাড়া। ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি রুশিয়া যুদ্ধে নামবার অনতিপরই তারা ডিগবাজী খেয়ে ইংরাজের অনুগত সুহৃদ্ বনে মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে সবাইকে ফ্যাসিষ্টদের গুপ্তচর প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মহাত্মাজী জাতীয় আন্দোলনে নারাজ হলেও ইংরাজের ভারতবর্ষকে বিনামতে যুদ্ধে নামানর প্রতিবাদ স্বরূপ ব্যক্তিগত আইন অমান্যের (Individual civil disobedience) ব্যবস্থা করলেন, যার ফলে ভাবে, নেহরু প্রভৃতি নেতারা কারাগারে রুদ্ধ হন, কারণ তাঁরা যে বক্তৃতা দিলেন তা ভারত রক্ষা আইনের বিধি অনুযায়ী দণ্ডার্হ। ভারত রক্ষা আইন ছিল নামের পরিহাস, ভারত অন্তর্গত ব্রিটিশ স্বার্থকে ভারতবাসীর হাত হতে রক্ষা করার জন্যই যে এ আইন পরিকল্পিত তা বলাই বাহুল্য।

ইতিমধ্যে এল ১৯৪০ সালের লিংলিথ গাওএর ঘোষণা যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ভারতবাসীরা নিজেরা মিলেই তাদের ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতির পরিকল্পনা করতে পারবে ও যে পরিকল্পনা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাই মেনে নেবে। ভারতবাসী আর ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করতে প্রস্তুত ছিল না, তারা ইংরাজের ভবিষ্যৎ আশ্বাসবাণীর রূপ বহুবার দেখেছে, বর্ত্তমানে কিছু না হলে ভবিষ্যতে যে ইংরাজ নিজের সর্ত্ত পালন করবে এ বিশ্বাস আর অতীতের অভিজ্ঞতা

হতে পোষণ করা সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে শাসন পদ্ধতির পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এ কথাটার ভেতর ইংরাজের চিরপরিচিত যে কূটনীতি লুকিয়ে ছিল তা জনগণের চোখ এড়াল না। নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সৃষ্টি (Communal representation) করে ইংরাজ তাদের পুরাণো ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করেছিল ও নিশ্চিন্ত ছিল যে যতদিন তারা ভারতে উপস্থিত থাকবে ততদিন সংখ্যা-লঘিষ্ট দল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না ও তাদের কল্পিত প্রাধান্যের জন্য ইংরাজের স্মরণাপন্ন হবেই। সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদ যে বর্ত্তমানে ইংরাজ চক্রান্তজাল বহির্ভূত যে কোন রাজ্যে অবর্ত্তমান তার সাক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্র নাথ তার শেষ জীবনে দিয়ে গেছেন। অশীতিবর্ষপূর্ত্তি উৎসবের অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন "মস্কাও শহরে গিয়ে রুশিয়ার শাসন কার্য্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানের কোনো বিরোধ ঘটেনা, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভেতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতের উপর প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ, আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহু সংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর।..................দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে

আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুষ্টিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এককালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্ত্তমান সভ্য শাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল''।

যুদ্ধের প্রথম হতেই মুসলিম লীগ তাদের অনুবর্ত্তীদের এই নির্দ্দেশ দিয়েছিল যে এ যুদ্ধে কোন প্রকার সহযোগিতা তাদের নীতির বিরোধী। যতদিন ইংরাজ তাদের 'পাকিস্থান' স্বীকার না করে নেবে ততদিন পর্য্যন্ত তারা ইংরাজের যুদ্ধে কোন প্রকার সহায়তা করবে না। তারা তাদের মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করতে নিষেধ করেছিল ও শাসনভার যতদূর সম্ভব নিজেদের আয়ত্তাধীনে আনবার জন্যই যত্নবান হয়েছিল। বাংলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক যখন এই নির্দ্দেশ সত্ত্বেও ডিফেন্স কাউন্সিলে সদস্য পদ গ্রহণ করেন তখন মুসলিম লীগ দণ্ড হিসাবে তাকে লীগ হতে বহিষ্করণের আজ্ঞা দেয়।

কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক নীতি ছিল নাৎসীবাদের বিরোধী, তাই তখনকার অবস্থায় ইংরাজের সহায়তা না করতে পারায় তারা দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিল। নাৎসীদের জয় যাত্রায় তারা মানসিক শান্তি পায়নি ও এ যুদ্ধে পৃথিবীর জন কল্যা-ণের জন্য কিছু একটা করতে তারা উৎসুক হয়ে উঠে। ফলে তারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানায় যে যদি তারা ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে ও বর্ত্তমানে দেশে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তন করে তবে নির্ব্বিবাদে কংগ্রেস জনগণকে ইংরাজের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দ্দেশ দেবে। কোন নতুন আইন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন

নাই, কেবল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিকে নিয়ে পুনর্গঠন করলেই চল্‌বে, রাজ প্রতিনিধি যেমন আছেন তেমনই থাকবেন, কেবল তাঁর এটা স্বীকাব কবে নিতে হবে যে সাধারণতঃ তিনি তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। যুদ্ধাদি ব্যাপার প্রধান সেনাপতি ( Commander-in-Chief ) যেমন চালাছেন তেমনি চল্‌বে, এব ভেতর অন্য কোন সদস্যের কোন কথা বল্‌বাব থাক্‌বে না। বস্তুতঃ কংগ্রেস চেয়েছিল এমন কিছু আশ্রয় যাকে অবলম্বন করে তাবা তাদেব নীতি অনুযায়ী জগতেব কল্যাণে এ যুদ্ধে একটা কিছু দান করে যেতে পারে। কংগ্রেসেব এ পরিবর্ত্তন মহাত্মাজী অনুমোদন করতে পারেন নি। অহিংস নীতিতে পূর্ণ আস্থাবান ঋষি কোনো অবস্থাতেই অস্ত্র ধারণ কবা সমর্থন কবতে পারেন না। যে নীতির জন্য তিনি স্বাধীনতা অর্জ্জনে অঙ্গুলি সঞ্চালন পর্য্যন্ত নিবারণ করে দিয়েছিলেন তথাকথিত জগতের বৃহত্তব স্বার্থের নামে তিনি তা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হন নি। ১৯৩৪ সালে তাঁর প্রস্তাবিত কংগ্রেসের সভ্য হবার প্রতিজ্ঞাপত্রে কংগ্রেসের মূল আদশ জ্ঞাপক 'নিরুপদ্রব' ও 'বৈধ' শব্দ দুইটির পরিবর্ত্তে 'সত্যনিষ্ঠ' ও 'অহিংস' শব্দ দুইটি বসান কংগ্রেস অনুমোদন না করায় তিনি এই অহিংস নীতির অনুপ্রেরণায়ই তাঁর আপন হাতে গড়া কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই হতে তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও নন যদি ও আজ পর্য্যন্ত সেই মহাসভা তাঁরই পরামর্শ ও নির্দ্দেশের দিকে তাকিয়ে থাকে ও তাঁর অনুমতি না নিয়ে কোনও বড় কাজে হাত দেয় না। এতদিনে পৃথিবী জেনেছে যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৯ সালে মহাত্মাজীকে বলেছিলেন যে তখনকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অতি শীঘ্র যুদ্ধ অনিবার্য্য, আর সে যুদ্ধে ইংরাজের লিপ্ত হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী। এই সুযোগে ইংরাজের বিপক্ষীয় শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের বাহিরে

সৈন্য গঠন করে ভারতে ঢুকে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেষ্টা ভারতবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। উত্তরে মহাত্মাজী তাঁকে হেসে উত্তর দিয়েছিলেন যে অহিংসা তার জীবনের মূল মন্ত্র, কোন হিংসনীতিতে তাঁর সহযোগিতা সুভাষচন্দ্র পাবেন না, তবে যদি তিনি সে অসাধ্য সাধন করতে পারেন তবে মহাত্মাজীই সর্ব্বপ্রথম বরমাল্য নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন, এ নিশ্চিত। মহাত্মাজীর আশীষ মাথায় নিয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর অনির্দ্দিষ্ট অভিযানে দেশ থেকে বেরিয়েছিলেন, বিজয়ীর রূপে তিনি দেশে ফিরতে পারেন নি, অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর সৃষ্ট আজাদ হিন্দ বীরবাহিনীর ফিরে আসতে হয় ভারতে বন্দী হিসাবে কিন্তু স্বাধীনতা অভিযানে যে জ্বলন্ত আদর্শ তারা সঙ্গে নিয়ে আসে তাতে পাগল করে দেয় সারা দেশটাকে ও ইংরাজকে বুঝিয়ে দেয় যে এবার তাদের ভারত শাসনের দিন ফুরিয়ে এসেছে। ব্রিটিশ দেশরক্ষা সচীব আলেকজেন্দার সে দিন মুক্তকণ্ঠে পার্লামেণ্টে স্বীকার করেছেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপারে ভারতব্যাপী যে বিদ্রোহের তোমানল কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছিল তা ভারতে অবস্থিত সমস্ত ইংলণ্ডবাসীকে পুড়িয়ে ছাই করে দিত যদি প্রথমে পার্লামেণ্ট ও পরে কেবিনেট মিশন সেখানে গিয়ে ভারতবাসীকে সত্যিকারের আশ্বাস দিতে না পারত যে ইংরাজরা এবার সত্যি সত্যি তাদের শাসন শৃঙ্খল তুলে নিয়ে যাবে।

কংগ্রেসের সহযোগ প্রস্তাব ইংরাজ শোনেনি। জাতি হিসাবে ভারতীয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতে তারা রাজী ছিল না, গোলামের মত ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার রাস্তা তাদের খোলা ছিল ও অর্থের প্রলোভনে কিছু কিছু দেশবাসী যে তাতে ঝুঁকে পড়েনি তা নয়।

ইংলণ্ডের অস্তিত্ব যখন পশ্চিম রণক্ষেত্রে টলায়মান তখন প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্ট মিলে ঘোষণা করলেন ভবিষৎ

পরিকল্পনায় তাদের আদর্শ, যা অ্যাটলান্টিক চার্টার ( Atlantic Charter ) নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পরবর্ত্তী সমাজে ব্যক্তিমাত্রই যাতে অভাব ও ভয় হতে মুক্তি লাভ করতে পারে ও নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী মতামত প্রকাশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা পেতে পারে এমন জগত সৃষ্টি করাই যে ইংলণ্ডের ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে, তাই অ্যাট্‌লান্টিক মহাসগরে প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ রণতরীতে বসে দুই মহাবণী লোক সমক্ষে প্রচার করেন। এর অধিকাংশ কথাই অস্পষ্ট ও হেঁয়ালি পরিপূর্ণ থাকায় ভারতবাসীকে তা তেমন উৎসাহিত করতে পারেনি। তারপর যখন চার্চ্চিল ঘোষণা করলেন যে ঐ চার্টার ভারতবর্ষে প্রযুজ্য নয় তখন যেটুকু আলেয়া এই ঘোষণা কোন কোন ভারতবাসীকে প্রলুব্ধ করেছিল তাও নিমেষে মিলিয়ে গেল।

কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী তাদের সহানুভূতি মিত্র শক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টার উপর ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী ইংরাজের পরাজয়ে খুসী বই দুঃখিত হয় নাই। সুভাসচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের রহস্য আজ আর জগতে অবিদিত নাই। অজানার সন্ধানে বেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য রুশিয়ার কোন সাহায্য লাভ করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত যে তিনি বার্লিনে পৌঁছে ভারতের স্বাধীনতার কল্যাণে হিটলারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তাও আজ দেশবাসী জেনেছে। কিন্তু সে সময় যখন বেতার যোগে এ সংবাদ ভারতে পৌঁচায় ও কেউ কেউ তার কণ্ঠস্বরও শুনতে পায় তখন কেউ বা তা বিশ্বাস করেছিল, কেউ করেনি। সুভাষচন্দ্রের কার্য্য কলাপ কংগ্রেসের হাই কমাণ্ড কখনই অনুমোদন করেনি, সুতরাং তাদের এ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার থাকা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশবাসী তখন কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তায় হতাশ হয়ে পড়েছিল ও তাদের বারম্বার ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব অনেকে সমর্থন করতে

পারেনি। তাই তারা যখন জানতে পারে যে সুভাষচন্দ্র ভারত স্বাধীনতাব প্রচেষ্টায় য়ুরোপে জাতীয় সেনানী গঠন করছেন, তখন জনসাধারণ এ সম্বন্ধে খুব নিরুৎসাহ প্রকাশ করেনি। দেশের বাইরে সৈন্যগঠন করে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন পৃথিবীর ইতিহাসে কিছু নতুন নয়। গ্যারিবল্ডী যে এই উপায়ে ইতালিকে অষ্ট্রিয়ার কবল হতে মুক্ত করেছিলেন তা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে। পরন্তু অন্যের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণের ঔৎসুক্য ও দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অহিংস নীতি অনুসরণ পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ, তর্কশাস্ত্রের যুক্তির ভেতর এর কোন স্থান আছে কিনা তাও সন্দেহ। এর ভেতর কূটনীতি যা আছে তাও দুর্ব্বোধ্য।

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সংবাদ পাওয়া গেল যে জার্ম্মানী অতর্কিতে রুশিয়াকে আক্রমণ করেছে। এ সংবাদ ভারতবর্ষকে যে বিহ্বলতা দিয়েছিল তা অবর্ণনীয়। অনেকেই আশা করেছিল যে রুশিয়ার সাহচর্য্যে নাৎসী নীতি ক্রমশই সংস্কার লাভ করবে ও অদূর ভবিষ্যতে এই দুই মহাশক্তি একত্রে মিলে সাম্রাজ্যবাদীর প্রতিপত্তি পৃথিবী থেকে লোপ করে দিবে। জার্ম্মানীর মধ্যস্থতায় অল্পদিন পূর্ব্বে রুশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের সন্ধি সংস্থাপন ও জাপান ও রুশিয়ার ভেতর অনাক্রমণের চুক্তি ( Non-Agression Pact ) এ বিশ্বাসকে আরও বলবতী করে তুলেছিল। কিন্তু আকস্মিক বজ্রাঘাতের ন্যায় এ সংবাদ সকলের আশা সমূলে উৎপাটিত করল। কম্যুনিষ্ট পার্টী প্রথম প্রতিক্রিয়া সামলে নিয়ে বিজ্ঞের মত ঘোষণা করল যে এ তাদের আগেই জানা ছিল। রাতারাতি তাদের ভোল বদলে গেল, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে ভারতবাসী শুনল যে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে, আর এখন থেকে বিনাসর্ত্তে ইংরাজের যুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা হল

কম্যুনিষ্ট পার্টীর নীতি। স্যোসালিষ্ট প্রমুখ অন্যান্য প্রগতিশীল দল অবিশ্যি ইংরাজের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই বলতে থাকল, যদিও রুশিয়ার মঙ্গলে তাদের ও জনসাধারণের সহানুভূতির কোন অভাব ছিল না। ডিসেম্বরের চতুর্থ দিনে নেহরু প্রমুখ কয়েকজন নেতা কারাগার হতে মুক্তি পান। এর তিন দিন পরেই আরম্ভ হল পূর্ব্ব এশিয়ায় ইংরাজ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান।

১৯৪২ সালের প্রথম ভাগে কংগ্রেসের অবস্থা দস্তুর মত সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টী ইংরাজের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল অন্যদিকে ঘটনা বিপর্য্যয়ে জনসাধারণ হয়ে উঠেছিল ইংরাজের বিরুদ্ধে অতিষ্ঠ ও তিক্ত। জাপানের আক্রমণে সুদূর প্রাচ্যে ইংরাজ সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত অচিরাৎ ধূলিসাৎ হয়। পূর্ব্বপ্রান্তে যুদ্ধের আরম্ভেই ইংরাজ রণতরী প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ ও রিপালস্ জাপানী বোমার আঘাতে সমুদ্রগর্ভে স্থান পায় ও মালয় একপ্রকার বিনাযুদ্ধেই জাপানের হস্তগত হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাচলে ইংলণ্ডের অজেয় দুর্গ সিঙ্গাপুর মাত্র ত্রিশ হাজার অগ্রগামী জাপানী সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সিঙ্গাপুর ও মালয়ে ইংরাজরা তাদের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী জাপানের হাতে তুলে দিয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে নিজেদের প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে, এ কাহিনীও ভারতবাসীর জানতে বাকী রইল না। ব্রহ্মদেশ হতে বেসামরিক ভারতবাসীর ভারতে চলে আসার কোন সুবিধা ইংরাজ করে দিল না, শ্বেতাঙ্গদের পলায়নের জন্য যে পথ নির্দ্ধারণ করা ছিল তা ভারতীয়দের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। দুর্গম পথে আসতে গিয়ে কত যে ভারতবাসী অনাহারে, রোগে পথেই প্রাণ হারাল তার ইয়ত্তা নেই। এই সব কাহিনী ও সেই সঙ্গে বেতার যোগে পূর্ব্ব এসিয়ায় বিপ্লবী

রাসবিহারী বোসের অধিনায়কত্বে ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স লীগের পত্তন ও তার অধীনে জেনারেল মোহন সিংহের নায়কত্বে পরিত্যক্ত ভারত সৈন্য নিয়ে স্বাধীনতা কল্পে জাতীয় সৈন্য গঠনের সংবাদে ভারতময় একটা প্রচণ্ড চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। লোকপরম্পরায় এ সংবাদও জানতে কারু বাকী রইল না যে জাপানীরা ভারতীয় সৈন্য ও স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে এশিয়া বাসীর সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করছে না, বরঞ্চ তাদের এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে ভ্রাতা বলেই গণ্য করছে। সুভাষচন্দ্র সে সময় বার্লিন থেকে বেতার যোগে নিরন্তর ভারতবাসীকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজনা যোগাচ্ছিলেন ও ভারতবাসী তার বাণীর ভেতরে পেয়েছিল আপন অন্তরের প্রতিধ্বনি। কংগ্রেস ভারতের এ প্রতিক্রিয়া দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ে কিন্তু ইংরাজ তাদের সামান্য সর্ত্তটুকু মেনে না নেওয়ায় আত্মমর্য্যাদা বজায় রেখে তাদের পক্ষে কম্যুনিষ্ট দলের মত ইংরাজের কাছে আত্মসমর্পন করাও সম্ভব হল না। ফলে ব্যর্থ ও নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে থাকা ছাড়া কংগ্রেসের আর গত্যন্তর রইল না। কংগ্রেসের এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব দেশ বাসী ক্ষমা করেনি, একদিকে কম্যুনিষ্ট দল যেমন তাদের চক্রশক্তির গুপ্তচর বলে গালি দিয়েছে অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী দেশবাসী ও তাদের ইংরাজের অনুচর বলে অবজ্ঞা করতেও কার্পণ্য করেনি। সে অবস্থায় মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে যখন স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য ও ভারতরক্ষায় ভারতীয়দের সহযোগিতা আকর্ষণ মানসে কেবিনেট হতে নয়া প্রস্তাব নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন তখন কংগ্রেস নেতারা এটাকে ভগবানের দান বলেই গ্রহণ করলেন ও একান্ত আগ্রহ নিয়েই আলোচনার্থ দিল্লী সমবেত হলেন।

* * * * *

(ক্রীপস্ প্রস্তাব : ক্রীপস্ প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত : ক্রীপস্ ও
মহাত্মা গান্ধী : পূর্ব্ব এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্সলীগ : ভারত
গভর্ণমেণ্টের ডিনায়াল নীতি : মহাত্মা গান্ধীর ইংরাজের
ভারত ত্যাগের দাবী : ১৯৪২ সালের বিদ্রোহ
ও ইংরাজের নৃশংসতা)

ক্রীপ্সের প্রস্তাবের ভেতর তার ব্যক্তিগত দান কতটা ছিল জানা নেই, ভারতবাসী মাত্রই তাঁকে ভারতের বন্ধু বলে জানত, তাই বড় আশা নিয়ে নেতৃবৃন্দ তার সকাশে যান, কিন্তু তিনি যখন তাঁর প্রস্তাব সবার সম্মুখে উপস্থিত করলেন তখন হতাশা ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া তাঁদের ভেতর হল না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। সেই প্রস্তাবের সর্ত্ত ছিল যে যুদ্ধোত্তর কালে ভারতবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি গণপরিষদে একমত হয়ে ভারত ইউনিয়ন সম্বন্ধে যে শাসন পদ্ধতির পরিকল্পনা করবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তা মেনে নিয়ে তাই পার্লামেণ্টে সুপারিশ করবে। এই গণপরিষদে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পদ্ধতি অবিশ্যি বর্ত্তমানের মত সাম্প্রদায়িক নিয়মেই হবে, তার কোন পরিবর্ত্তন চল্বে না। আর যদি কোন প্রদেশ সেই নতুন শাসন পদ্ধতি না মানতে চায় তবে তাদের ইউনিয়ন হতে পৃথক শাসন সংস্থাপনের পূর্ণ অধিকার থাকবে। ভারতের নৃপতিবৃন্দ ইচ্ছামত ইউনিয়নের ভেতরে আসতে বা বাইরে থাকতে পারেন। সেই সব রাজ্যের জনগণের কোন অস্তিত্ব এ প্রস্তাবে স্বীকৃত ছিল না। বর্ত্তমানে যতদিন যুদ্ধ চল্বে ততদিন ব্রিটিশ শাসন শিথিল করা সম্ভব নয় ও যুদ্ধ পরিচালনার কোন ভার কমাণ্ডার ইন চীফ্ ও মিত্রশক্তির কাউন্সিলের বাইরে কারো হাতে দেওয়া অসঙ্গত। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় বড়লাটকেই রাখতে হবে তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকে ভারত সরকারে কিছু স্থান করে দিতে তারা প্রস্তুত আছেন ও ব্রিটিশ সরকার

আশা করেন যে তাঁরা তাঁদের সুপরামর্শ দিয়ে রাজ প্রতিনিধিকে যুদ্ধ জয়ে প্রভূত সাহায্য করবেন।

ইংরাজের ভবিষ্যৎ দানের ওপর আস্থা দেশবাসী বহুপূর্ব্বেই হারিয়েছিল, সেজন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কেউই তেমন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি। প্রদেশ ও তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যের ইচ্ছানুযায়ী ইউনিয়নের বাইরে থাকার ব্যবস্থা ও বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক নিয়মে গণপরিষদের নির্ব্বাচনের পরিকল্পনা সমস্ত প্রস্তাবটাকে হাস্যকর ছাড়া আর কোন রূপ দিতে পারেনি। কংগ্রেস চেয়েছিল বর্ত্তমানে এমন কিছু সম্মানজনক সর্ত্ত যাকে অবলম্বন করে তারা মিত্রশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চক্রশক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এ প্রস্তাবে সে আশ্রয় মিল্‌ল না, তাই একে প্রত্যাহার করা ছাড়া কংগ্রেসের গত্যন্তর রইল না। মুসলিম লীগেরও এ প্রস্তাব মনোমত হল না, কারণ তাদের মতে এর ভেতর পাকিস্থানের স্বীকৃতি ছিল না, আর হিন্দুমহাসভা এর ভেতর পাকিস্থানের পরোক্ষ ভাবে স্বীকৃতি দেখতে পেয়ে এ প্রস্তাব প্রত্যাহারের সংকল্প করল।

ক্রীপস্ সেই প্রথম ভারতে আসেন নি। এর পূর্ব্বেও তিনি ভারত পরিভ্রমণ করে গেছেন ও ভারতের অবস্থাও তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করে গেছেন তার মর্য্যাদা রক্ষা করে কিরূপে এই হাস্যকর ও অপমানজনক প্রস্তাব নিয়ে তিনি এ দেশে আসতে পারলেন তাই দুর্ব্বোধ্য। ক্ষমতা পেলে যে সব শ্বেতাঙ্গই এক, ব্রাইট, বার্কের যুগ যে ইংরাজ ইতিহাস হতে অনেক দূরে সরে গেছে সে সম্বন্ধে আর ভারতবাসীর কোন ভ্রান্তি রইল না।

ক্রীপস্ তার প্রস্তাব ভারতবাসীকে না মানাতে পারায়, যাবার সময় তা তুলে নিয়ে গেলেন। সে প্রস্তাবে দেবারও বিশেষ কিছু ছিল না,

কেবল নেহক, জিন্না প্রভৃতি জননাযককে সবকাবী দপ্তবে চাকুবী দেওযা ছাডা। ইংবাজেব, বিশেষ কবে ক্রীপ সেব, এটা জানা উচিত ছিল যে ভাবতীয নেতাবা সবকাবী দপ্তবে চাকুবীব জন্য কখনই লালাযিত হযনি। পববর্ত্তীকালে ক্রীপস্ বলেছেন যে কংগ্রেস কার্য্যকবী সমিতি তাঁব প্রস্তাব গ্রহণ কবত, কেবল গান্ধীজী মাঝে পডে তা কবতে দেননি। মুসলিম লীগ ও হিন্দুমহাসভা কাব বিবোধিতাতে তাঁব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবেছিল তা অবিশ্যি তিনি বলেননি। কংগ্রেস কার্য্যকবী সমিতিব কোন অবস্থায সত্য সেরূপ দুর্মতি হয়েছিল কিনা সঠিক জানা নেই, তবে মহাত্মা গান্ধীই যদি তাদেব তা থেকে নিবৃত্ত কবে থাকেন, তবে সে সমযে দেশকে পবম অকল্যাণেব হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনিই দাযী। মহাত্মাজী ক্রীপসকে স্পষ্টাস্পষ্টিই বলেছিলেন যে ভবিষ্যৎ মূলধনেব ওপব কাটা চেক্ ( Post-dated cheque ) নিযে তিনি মাথা ঘামাতে নাবাজ, বর্ত্তমানেব প্রস্তাবে এমন কিছু তিনি দেখতে পাচ্ছেন না যা নিযে ভাবতবাসীব উৎফুল্ল হবাব কোন হেতু আছে। এও শোনা যায় যে মহাত্মা গান্ধী ক্রীপসকে প্রশ্ন কবেছিলেন যে ভাবত বক্ষাই যদি ইংবাজেব সত্যিকাবেব উদ্দেশ্য হযে থাকে তবে তাব কল্যাণে বর্হি প্রেরিত সমস্ত ভারতীয় সৈন্য ইংবাজ ভারতে ফিবিয়ে আনতে প্রস্তুত আছে কিনা আর ভাবত বক্ষাব ভাব তাবা কোন সুদক্ষ রুশিয়ান্ জেনা-বেলের হাতে ছেডে দিতে বাজী কিনা। ক্রীপস্ এব কোন সদুত্তব দিতে পারেননি। এই বোধ হয ক্রীপসেব মহাত্মাজীব ওপব বীতরাগ হবাব কাবণ।

এব পরে যুদ্ধ পবিস্থিতিতে মিত্রশক্তির অবস্থাব দ্রুত অবনতি হতে থাকে। পশ্চিম প্রান্তবে জার্ম্মানী ইউক্রাইন দখল করে স্টালিনগ্রাডের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসে। উত্তর আফ্রিকায় ইংবাজেব নিদারুণ

পরাজয় ঘটে ও পূর্ব্বাচলে ব্রহ্মদেশ প্রায় পরিপূর্ণ জাপানের তাঁবে এসে পড়ে। ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন পূর্ব্ব এশিয়ার ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্স লীগের সম্মেলনে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে জাপানী গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক যেন তারা জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগ সংস্থাপন করে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্রকে পূর্ব্ব এশিয়ায় আনবার ব্যবস্থা করেন। একমাত্র সুভাষ চন্দ্রকেই পূর্ব্ব এশিয়ার সমগ্র ভারতীয়রা নেতা বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত ও তিনি এসে যদি আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তবে স্বাধীনতা অভিযান নবীন প্রেরণা ও প্রচণ্ড শক্তি লাভ করবে।

সমগ্র ব্রহ্মদেশ জাপানের আয়ত্তাধীনে আসায় যুদ্ধ ভারতের সীমান্তে এসে পড়ল, ইংরাজের ভারত রক্ষা আইনের কড়াকড়িই ● বাড়্‌ল, ডিনায়াল নীতির খাতিরে জেলেদের নৌকা গাড়োয়ানের গাড়ী ঘোড়া, বস্তুতঃ তাদের জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র উপায়, তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল। তদুপরি ধান্য শস্য পাছে জাপানীদের হাতে পড়ে এ আশঙ্কায় চাষীদের হাত থেকে তা কেড়ে নিয়ে কিছু বা করা হল নষ্ট ও বাকীটা করা হল গুদামজাত, যাতে ইচ্ছামতই তা ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে। জাপানীর অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গেই যে ইংরাজ পূর্ব্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমে ঘাঁটি করবে এ সংবাদও তখন লোকপরম্পরায় শোনা যাচ্ছিল।

মহাত্মা গান্ধী এতে শান্তি পেলেন না। দেশ রক্ষার জন্য একটা কিছু যে দরকার সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা রইল না। অন্তরে বাহিরে অনেক অনুসন্ধান করে যে নীতি তিনি শেষ পর্য্যন্ত অবলম্বন করা মনস্থ করলেন তা ইংরাজের ভারত পরিত্যাগের দাবী ( Quit India ) নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মহাত্মাজীর মতে কোন জাতিই

ভারতবাসীর শত্রু নয়, ভারত মৈত্রীর বাণী নিয়ে জগৎ সম্মুখে হাত বাড়াতে উন্মুখ, কিন্তু ইংরাজ শৃঙ্খলবদ্ধ ভারতের সে পথ বন্ধ। আজ যদি জাপান ভারত আক্রমণ করে দেশ ছারখার করে দেয় তবে সে জন্য প্রধানতঃ দায়ী হবে ইংরাজ, ইংরাজ ভারতকে শতাব্দীর পর শতাব্দী শাসনাধীনে রেখে যথেচ্ছা শোষণ করে নিজের ধনসমৃদ্ধি বাড়িয়েছে বলেই সবার এখন ভারতের উপর দৃষ্টি। ইংরাজের শাসন শৃঙ্খল তুলে নেওয়ার দিন এসেছে, তারা চলে গেলে ভারতের কি দশা হবে তা নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, ভারতকে ভগবান ও নিয়তির হাতে সমর্পণ করে চলে যাওয়াই এখন তার কর্ত্তব্য। জাপানের চীন আক্রমণ ও তার উপর দুর্ব্যবহার কখনই সমর্থন করা সম্ভব নয় কিন্তু শৃঙ্খল মুক্ত ভারত সুযোগ পেলে অহিংস নীতিতে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী দিয়ে জাপানের এ দুর্নীতির সংস্কার করতে পারবে, এ আশা মহাত্মাজী পোষণ করেন। ১৯৪২ সালে ৮ই আগষ্ট বোম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে অভিভাষণে তিনি বলেন যে ভারতবাসী হিসাবে জগতের কল্যাণে এই তোমাদের কর্ত্তব্য, ইংরাজ শাসন শৃঙ্খল তুলে না নিলেও তোমাদের নিজকে স্বাধীন বলেই মনে করতে হবে ও আজ এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করতে হবে যে "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" ( Do or Die )। কোন কিছু করবার পূর্ব্বে শান্তি সংস্থাপন সম্ভব কিনা সে চেষ্টা গান্ধীজী চিরদিনই করে এসেছেন, তাই আন্দোলন সুরু করবার আগে তিনি রাজ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ কামনা করে পত্র দেন। কিন্তু সে পত্র রাজপ্রতিনিধির হাতে পৌছাবার পূর্ব্বেই, বস্তুতঃ এর পরদিনই গান্ধী প্রমুখ সমস্ত নেতা ব্রিটিশ কারাগারে স্থান পেলেন।

এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল তা অবর্ণনীয়। নেতৃহীন আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে অহিংস নীতি পরিত্যাগ করেছিল

সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংরাজ সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের তুলনায় তা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। পাইকারী জরিমানা, বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ, জনতার ওপর যথেচ্ছা লাঠি ও গুলি চালান অসহযোগ আন্দোলনের পর ইংরাজ রাজত্বের একটা দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা দেখে আঁৎকে উঠবার লোক তখন আর ছিলনা। কিন্তু এবার যখন ভারত রক্ষার্থ সরকার অঞ্চল বিশেষে গ্রামকে গ্রাম অগ্নিযোগে নিঃশেষ করে দিতে আরম্ভ করল, অতর্কিতে বিমান আক্রমণে নির্ব্বিচারে জনসাধারণকে হত্যা স্বুরু করল ও সৈনিক ও পুলিসের নারী ধর্ষণ পর্য্যন্ত পরোক্ষভাবে সমর্থন করে গেল, তখন ইংরাজের অতিবড় ভক্তকেও স্বীকার করতে হল যে এর থেকে নির্ম্মমতা তারা কল্পনা করতে পারে না। নাৎসী ও জাপানী অত্যাচারের বিভীষিকা বর্ণনা করে ভারতবাসীকে আঁৎকে দেওয়ার চেষ্টা যুদ্ধের প্রথম থেকেই চলছিল কিন্তু বিভীষিকার যে চিত্র ইংরাজের অত্যাচার আমাদের চোখের সামনে দেখাল তা অতুলনীয়। বাস্তব কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু দেশের লোক তাতে দমল না, বিদ্রোহকে অনেক স্থানে টুঁটি চেপে মারা সত্বেও, বাংলা ও বিহারের অনেক অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা হয় ও যতদিন পর্য্যন্ত না মহাত্মাজী জেল থেকে বেরিয়ে তাদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দ্দেশ দেন ততদিন নির্ব্বিবাদে সে শাসন তারা ইংরাজের ক্ষমতা বহির্ভূত রেখেই চালিয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রবাদী শ্রীযুত্ জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শ্রীমতী অরুণা আসফ্ আলি অহিংস নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁরা গোপনে ইংরাজ রাজত্বের উৎখাতের জন্য কাজ করে গেছেন, কেউ তাঁদের প্রতিরোধ করতে পারেনি। এখন জানা গেছে যে কংগ্রেস স্যোসালিষ্ট পার্টি কোহিমাতে নেতাজীর আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে যোগ সংস্থাপন করতেও চেষ্টা করেছিল। নেতাজীর

সৈন্য যদি ভাগ্যক্রমে ভারতে প্রবেশ করতে পারত তবে তাদের শক্তি বাড়াবার লোকের এখানে অভাব হত না।

* * * * *

[ পঞ্চাশের মন্বন্তর ও ইংরাজের দায়িত্ব ]

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যখন ইংরাজ কারাগারে আবদ্ধ ও কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই যখন ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী বেআইনী বলে ঘোষিত তখন ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ইংরাজের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এমন কিছুই করেনি যা জনসাধারণের মনে কোন আস্থা স্থাপন করতে পারে। হিন্দু সভার ভেতর তাদের অন্যতম নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জির মিদনাপুর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ ছাড়া আর কোন কার্য্যকারিতা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। মুসলিম লীগ বাংলায় কোয়ালিসন ভেঙ্গে লীগ্ মন্ত্রীত্ব গঠনে ব্যস্ত ছিল ও কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের প্রচারিত রীতি অনুযায়ী ইংরাজের সমস্ত কার্য্যাবলীর সমর্থন করতে গিয়ে দেশের এ বিদ্রোহীদের বিভীষণ বাহিনী আখ্যা দিতে আরম্ভ করল। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে ( বাংলা ১৩৫০ ) দেখা দিল দেশে দারুণ মন্বন্তর, যার ফলে কয়েক মাসের ভেতর দেশে এত লোক অনাহারে মরল যে সমগ্র যুদ্ধের মৃত্যু তালিকা তার কাছে নগণ্য। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাসে দুর্ভিক্ষের অন্ত নাই, কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের ইতিহাস সকলকে হার মানিয়ে দিয়েছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দায়ী হলেও প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তার ভেতর দায়িত্ব ছিল না, আর সে সময় মুসলমান রাজত্বের বিলুপ্তি না হওয়ায় সমস্ত দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ইংরাজ ইতিহাসে নিজের কলঙ্ক কাহিনী চাপা দিতে-

ও খানিকটা সমর্থ হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তাও সম্ভব নয়। চক্র শক্তি পৃথিবীতে হিংস নীতি অবলম্বন করে অনেক নিরীহ জনসাধারণের মৃত্যুর কারণ হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংরাজ যে তার শাসনাধীন ভারতবাসীকে গরু ভেড়া রূপে গণ্য করে স্বেচ্ছায় অনাহারে হত্যা করেছে সে কাহিনী কি সভ্যতার ইতিহাসে তার থেকে কম কলঙ্কময়? এ মৃত্যুর তাণ্ডবলীলার জন্য অনেক দেশী ও বিদেশী চোরাকারবারীরা দায়ী সন্দেহ নাই, কিন্তু তার জন্য ইংরাজ কি ন্যায় বিচারে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে? ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী অনেক বিধানই তখন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, মোটা মাহিনায় অনেক রাজ কর্ম্মচারী সরকারী খাদ্য বিভাগে স্থান ও পেয়েছিল, কিন্তু যেখানে রক্ষকই ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায় সেখানে জনসাধারণের পরিত্রাণ কোথায়? নইলে সরকারী গুদামে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য পচে নষ্ট হয়ে গেল কিন্তু দেশবাসী অনাহারে রাস্তায় পড়ে মরল, ইতিহাসে কি এর কোন জোড়া আছে? সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশ থেকে এক লক্ষ টন্ চাউল ভারতে পাঠাবার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ভারত সরকার সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি! যুদ্ধ জয় ইংরাজের হয়েছে, নিজের বাহুবলে না হলেও তার বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট শক্তির অনুকম্পায়, কিন্তু কি বিরাট ব্যর্থতা, কি প্রচণ্ড বিভীষিকা তারা চাপিয়ে দিয়ে গেল তাদের আশ্রিত এই ভারত-বাসীর উপর! তাদের অপরাধ যে ইংরাজের বিপদের সুযোগ নিয়ে তারা তাকে বিধ্বস্ত করবার কোন চেষ্টা করেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বাণীতে বলে গেছিলেন "এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা, মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।<br>
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

সেদিন তার প্রমাণ পাই নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী ইতিহাস আজ মনে করিয়ে দিচ্ছে যে গুরুদেবের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হবে না।

*　　*　　*　　*　　*

[ আজাদ হিন্দ্ বাহিনী ও নেতাজী ]

১৯৪৩ সালের ২০শে জুন টোকিয়ো রেডিও ঘোষণা করে যে সুভাষ চন্দ্র টোকিয়োতে এসে পৌঁচেছেন ও তিনি অবিলম্বে আজাদ্ হিন্দ দলের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করবেন। পরদিনই বেতার যোগে শোনা গেল টোকিয়ো হতে সুভাষ চন্দ্রের কণ্ঠস্বর। সমগ্র বিশ্বের ভারতীয়কে সম্বোধন করে তিনি বলেন যে নির্ব্বিবাদে ইংরাজের ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের আশা বাতুলতা মাত্র। স্বাধীনতা দানের সামগ্রী নয়, সংগ্রাম ব্যতিরিকে এ অর্জ্জন করা অসম্ভব। স্বাধীনতা অভিযানে বহিঃ শক্তির সাহায্য গ্রহণ পৃথিবীতে কিছু নতুন নয়। গ্রীস্, ইতালি, আমেরিকা এমন কি আয়রল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বহিঃ শক্তির সাহায্য নিয়েই তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয় লাভ করেছিল, তাতে তাদের সে অভিযানে বিন্দুমাত্র কলঙ্কের ছোঁয়া লাগেনি। ভারতবর্ষের পুরাণো ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে অনেককেই সাবধান করে দিতে পারে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মোগল সাম্রাজ্যের উৎখাত, সেটা স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়। চিত্তের বিভ্রম বশতঃ ভারতবাসী বিদেশীর মোহগ্রস্ত হয়ে তাকেই নিজ বাহুবলে সিংহাসনে বসিয়েছিল। বিদেশীর শাসন শৃঙ্খল তারা স্বেচ্ছায় বরণ করেছিল, ভুলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়নি। আজ একাধিক শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় তাদের সে

মোহ ঘুচে গেছে। আজ তারা বুঝেছে যে বিদেশী বণিক ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য শাসন ভার গ্রহণ করেনি, তারা এসেছিল তাদের কূট শাসনের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে ভারতবাসীকে অমানুষ করে দিতে, যাতে তারা চিরজীবন ধরে ভারতে বসে তাদের চৌর্য্যবৃত্তি চালাতে পারে। ভারতের ভাগ্যবিধাতা বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতকে সেই তস্করের হাত হতে মুক্তি পাবার সুযোগ দিয়েছে, এ সুযোগ হেলায় হারালে আর নাও আসতে পারে। ইংরাজ যতদিন ভারতে ঘাঁটি করে থাকবে ততদিন নিপনের পূর্ব্ব এসিয়ার রাজ্য নিরাপদ নয়। তারা তাদের নিজ স্বার্থেই ইংরাজকে ভারত থেকে দূর করবার প্রয়াসী হবে। এ বিষয়ে আমাদের উভয়ের স্বার্থ এক, তাই স্বাধীনতা অর্জ্জনে নিপনের সাহায্য গ্রহণে কোন গ্লানি নাই। স্বাধীনতা অর্জ্জন করলেই আমাদের সংগ্রাম শেষ হবে না, আমাদের তা রক্ষাও করতে হবে। যদি ঘটনা বৈচিত্র্যে নিপনের কখনও ভারতে ইংরাজকে সরিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খা জন্মে তবে আমরা তখন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিপনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে কুণ্ঠিত হব না।" নেতাজী এ কথাটা তাঁর আজাদ্ হিন্দ্ সৈন্যকে বার-ম্বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে স্বাধীনতা অভিযানে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রথম অধ্যায় মাত্র। পরে তাদের অনেক রাজ্যলোলুপ শক্তির বিরুদ্ধে, এমন কি তাদের বর্ত্তমান মিত্র নিপনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হতে পারে। তাই যারা সে ফৌজে আস্‌বে তারা আশু কোন্ ফল লাভের আশা নিয়ে যেন এতে প্রবেশ না করে, কারণ জীবনে শান্তি ও আরাম এদের ভাগ্যে নাই। দেশের জন্য নিঃশেষে "ধন, মন ও তন্" বলি দিতে হবে, আর তাই তাদের অক্ষয়ের পথে নিয়ে যাবে। নেতাজীকে যে সব দেশবাসী জাপানের ক্রীড়ণক বলে অবজ্ঞা

করেছে তাদের মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। দ্বি শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার ফলে জাতীয় জীবনে মানসিক বিকার অবশ্যম্ভাবী, তাই দাসমনোবৃত্তি ও শ্বেতাঙ্গমোহ আজও যে আমরা মন থেকে দূর করতে পারিনি এর ভেতর আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র আজাদ্ হিন্দ দলের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। এখন জানা গেছে যে জাপান সমর বিভাগের সঙ্গে বিতণ্ডার ফলে প্রথম আজাদ্ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে যায় ও সে বিভাগের কর্তৃপক্ষ কিছুদিনের জন্য মোহন সিংহকে কারারুদ্ধও করেছিল। নেতাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জাপান সমর বিভাগ আর কখনও আজাদ্ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে কোন কর্তৃত্ব চালাবার অবকাশ পায়নি। নিপন বাহিনী ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনী দুই মিত্র শক্তির সৈন্যরূপেই পাশাপাশি কাজ করে গেছে। একমাত্র নেতাজার বিরোধিতার জন্যই জাপান সমর বিভাগ নির্ব্বিচারে বাংলার বুকে তাদের বিমান আক্রমণ চালায়নি, নইলে তা যে অসম্ভব ছিল না তা সবাই জানে।

নেতাজী ও আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর ভাগ্য অনুসরণ করবার জন্য যাঁরা সাগ্রহে ভারত রক্ষা আইন অমান্য করে সোনান্এর আজাদ হিন্দ্ বেতার বার্ত্তা শুনতেন তাঁরা যথা সময়েই ২২শে আগষ্টে রাণী ঝান্সী বাহিনীর গঠন ও ২১শে অক্টোবর সাময়িক আজাদ্ হিন্দ্ শাসন প্রতিষ্ঠান পত্তনের সংবাদ পেয়েছিলেন। এই সামরিক আজাদ্ হিন্দ শাসন প্রতিষ্ঠান ( Provisional Government of Free India ) যে ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করেছিল তাও তাদের অজানা ছিল না। সেই জাতীয় সঙ্গীত "কদম কদম বাড়ায়ে যা", সেই "দিল্লী চলো" সমর ধ্বনি যা পরবর্ত্তী ভারতকে বিদ্যুৎ স্পর্শে আলোড়িত করেছিল,

তা তখনকার বেতার শ্রোতাদের মনে হয়ত তেমনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জয়যাত্রা ও কোহিমা অধিকার ভারতীয় বেতার শ্রোতৃবৃন্দের মনে একটা নবীন আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু অনতিপরেই শোনা গেল ভাগ্যবিড়ম্বনায় ইম্ফল রণক্ষেত্রে সেই বাহিনীর ব্যর্থতা ও ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্ত্তন। নবীন আশার মুখে বজ্রাঘাত। ১৯৪৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আণবিক অস্ত্রাঘাতের পর জাপানের মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, উপায়ন্তর না থাকায় আজাদ্ হিন্দ বাহিনী ও ইংরাজের হাতে আত্মসমর্পণ করে। জিঘাংসা পরায়ণ ইংরাজ, বিপ্লবীদের একটা মর্ম্মান্তিক শিক্ষা দেওয়ার অভিলাষে দিল্লী দুর্গে সামরিক বিচরালয়ে তাদের বিচারের অভিনয় সুরু করেন। বস্তুতঃ ইংরাজ কূটনীতির ইতিহাসে এর থেকে মারাত্মক ভুল আজ পর্য্যন্ত হয়নি। নেতাজী হয়ত আর ইহলোকে নাই, আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাসের যবনিকা পাত হয়ত ইম্ফালের রণক্ষেত্রেই হয়ে গেছে, কিন্তু যে উন্মাদনা শক্তি তারা তাদের নির্ভীক আত্মত্যাগের আদর্শের ভেতর দিয়ে ভারতবাসীর মনে জাগিয়ে দিয়েছিল তা অজেয় ও অবিনাশী। স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্তদানের আদর্শ ভারতে কিছু নতুন নয়, গান্ধীজীর আহ্বানে সহস্র সহস্র নরনারী অকাতরে তাদের প্রাণ বিসর্জ্জন করতে এগিয়ে এসেছে, কখনও পশ্চাৎ পদ হয়নি। কিন্তু যে আত্মবিচ্ছেদের বিকৃত রূপ বিদেশী চক্রান্তফলে ভারত প্রচ্ছদপটে ক্রমশঃ নৃশংস আকার ধারণ করছে কংগ্রেস ও জাতীয় মুসলমান নেতারা আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে যার কোন মীমাংসাই করে উঠ্‌তে পারেন নি, নেতাজী নিজ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাধুর্য্য বলে তার কোন আলোড়নই তাঁর আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজে বা পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতবাসীকে স্পর্শ করতে পারেনি। বিভিন্ন ধর্ম্মমত পোষণ করেও যে ভারতবাসী সহোদরের ন্যায় হাতে হাত মিলিয়ে বিদেশীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা

অভিযানে একমত হতে পারে নেতাজী প্রত্যক্ষ ভাবে সেটা জগৎকে দেখিয়ে গেছেন। নেতাজী প্রমাণ দিয়েছেন যে এই সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডার মূল একমাত্র ইংরাজের চক্রান্ত, এর সত্যিকারের কোন ভিত্তি নাই

*    *    *    *    *

[ জাতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও সিমলা কনফারেন্স : আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচার : ভারত ব্যাপী বিপ্লবের সূচনা : আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও কংগ্রেস : ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচন ও তার ফলাফল : পার্লামেণ্ট ডেলিগেসন ও ক্যাবিনেট মিশন : সাময়িক অন্তর্বর্ত্তী ভারত গভর্ণমেণ্ট : অ্যাটলির ভারতত্যাগের ঘোষণা ও তার প্রতিক্রিয়া : ৩রা জুনের ঘোষণা ও পাকিস্থান স্বীকার ]

১৯৪৩ সালে লর্ড ওয়াভেল ভারত শাসন ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালের পশ্চিম রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তির ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেখানে তাদের জয় একপ্রকার সুনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত জাপানের রণশক্তির কোন ভাঙ্গন দেখা যায় নি। ইতিমধ্যে কস্তুরবার তিরোধানের পর মহাত্মাজীর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিনাসর্ত্তে স্বাস্থ্যের কল্যাণে মুক্তি দান করে। মুক্তির পর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ত্তমান পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করবার জন্য তিনি কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাতের অনুমতি কামনা করে ব্যর্থ মনোরথ হন। ১৯৪৫ সালে ভারত সরকারের নীতির আবার পরিবর্ত্তন আসে। ওয়াভেল কংগ্রেসের নেতাদের বিনা-সর্ত্তে মুক্তির আদেশ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝা পড়া সম্বন্ধে

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য বিমান যোগে লণ্ডন যাত্রা করেন। লণ্ডন হতে ফিরে তিনি বেতার যোগে এই বার্ত্তা দেন যে তিনি ভারত সরকারের কার্য্যকরী সভা ( Executive Council ) পরিবর্ত্তন করে সেখানে রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান সেনাপতি ব্যতিরিকে একমাত্র ভারতীয়-দেরই যাতে স্থান হয় সেরূপ ব্যবস্থা করতে চান। একমাত্র ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে সে সভার সংগঠন তাঁর অভিপ্রেত। এরূপ শাসন পরিষদ প্রতিষ্ঠানের পর বর্ত্তমানে রাজপ্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ( External Affairs ) কোন ভারতীয় সদস্যের দপ্তরে হস্তান্তরিত হবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাদের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতে একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত করবেন। নতুন শাসন পরিষদের প্রধান কর্ত্তব্য হবে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা, ভারতের শাসন নিয়ন্ত্রণ ও পরবর্ত্তী শাসন সংস্কার সম্বন্ধে একটা চুক্তি প্রচেষ্টা। এই ঘোষণার অনতিপরেই ওয়াভেল সিমলায় একটি কনফারেন্স আহ্বান করেন। তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও তদানীন্তন ও অতীতের প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীরা আমন্ত্রিত হন। সিমলা কন্‌ফারেন্স সাম্প্রদায়িক মীমাংসার অভাবে ফলবতী হল না। শাসন ব্যবস্থা মীমাংসার চেষ্টায় নিষ্ফল হলেও সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডার সৃষ্টি ব্যাপারে ইংরাজের স্বার্থের দিক হতে এ কন্‌ফারেন্স খুবই সাফল্য লাভ করেছিল। তাই জিন্না যখন সমস্ত প্রচেষ্টাকে ওয়াভেলের পাকিস্থান বিনাশের ষড়যন্ত্র বলে ঘোষণা করলেন, তখন ওয়াভেল তাতে বিন্দুমাত্র মনঃক্ষুণ্ণ হলেন না।

যুদ্ধান্তে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের বিচার নিয়ে সমগ্র ভারতব্যাপী যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হল, ইংরাজ ইতিহাসে তা নতুন। সৈন্যবিভাগ ও নৌবাহিনীর চাঞ্চল্য ও দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটে এবার ব্রিটিশ সিংহ সত্যই বিব্রত হয়ে পড়লেন, কিন্তু আত্মসম্মান অব্যাহত রেখে সে বিচার

অভিনয় পরিত্যাগ করাও তার সম্ভব হল না। তাই শেষ পর্য্যন্ত কোন রকমে নিজের নাক রক্ষা করে তারা শাহ্‌নওয়াজ, সাইগল ও ধীলনকে অপরাধী প্রতিপন্ন করে বিনা শাস্তিতে মুক্তি দেয়। কিন্তু দেশে যে বিদ্রোহের অনল জ্বলে উঠেছিল তা অত সহজে নিভ্‌বার নয়। কংগ্রেস অবিশ্যি এ পরিস্থিতিতে সুখী হতে পারেনি। তারা আশা করেছিল যে এবার বিনা রক্তপাতেই দেশে স্বাধীনতা আস্‌বে, আর যদি রক্তেরই প্রয়োজন হয় তবে তা আরও সংঘবদ্ধ ভাবে দিতে হবে, এরূপ অসংযত নেতৃহীন অভিযানের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ভারতের অনাগত বিদ্রোহকে শক্তিহীন করে দেবে, এই ছিল তাদের আশঙ্কা।

আজাদ্‌ হিন্দ্‌ ফৌজের সমর্থনে কংগ্রেস উঠে পড়ে লাগায় কংগ্রেসের ভেতর যে মনোমালিন্য ছিল তা অতি সহজেই মিটে গেল। ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রবাদীরা সরকারী কংগ্রেসের সঙ্গে একজোটে কাজ করতে স্বীকৃত হল ও কংগ্রেস জনসাধারণের চোখে নতুন প্রতিষ্ঠা লাভ করল। কংগ্রেসের কথায় তাই জনসাধারণ অপেক্ষা করতে প্রস্তুত হল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আর ব্রিটিশ সরকারের কোন ভ্রান্তি রইল না যে আশু কোন মিটমাট না করতে পারলে ভারতে গণবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনভার এসে পড়ে। ১৯৪৬ সালের প্রথমে ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তার ফলে দেখা গেল যে ভারতব্যাপী অমুসলমান সম্প্রদায়ের কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিনিধি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র মুসলমানেরা মোটামুটি মুসলিম লীগকেই তাদের মুখপাত্র মনে করে ও শিখদের কংগ্রেসের সঙ্গে নীতিগত কোন পার্থক্য না থাকলেও তারা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চায়, অনুন্নত শ্রেণী একমাত্র কংগ্রেসের উপরই আস্থাবান ও শ্রমিক শ্রেণী

কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর নির্ভরশীল নয়, তাদের স্বার্থরক্ষার ভার তারা কংগ্রেসের হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনোভাবের একটা পূর্ণ ছবি সংগ্রহ করবার জন্য পার্লামেণ্ট হতে বিভিন্ন দলের একটি ডেলিগেসন্ আসে। ফিরে তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের মতামত প্রকাশ করবার পর ভারত সচীব লর্ড পেথিক লরেন্সের অধিনায়কত্বে একটি ক্যাবিনেট মিশন ২২শে মার্চ্চ বিমান যোগে করাচী পদার্পণ করে। এই মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ ও আলেকজেন্দার। লর্ড ওয়াভেল ও কংগ্রেস ও মুসলিম দলের প্রতিনিধিকে নিয়ে অনেক বিচার ও আলোচনার পর তাঁরা ঘোষণা করেন যে ভারতের শাসনভার হস্তান্তরিত করার দিন এসে গেছে। ভারতীয়দের হাতে শাসনভার দেওয়ার জন্য এখন ব্রিটিশ সরকার উন্মুখ, কিন্তু ভবিষ্যতে কি শাসন পদ্ধতির পরিকল্পনা হবে ও কার হাতে সেই শাসনভার হস্তান্তরিত করা হবে তা ঠিক হওয়ার পূর্ব্বে বর্ত্তমানে কেন্দ্রে একটি সাময়িক অন্তর্বর্ত্তী শাসন পরিষদ স্থাপন প্রয়োজন ও সে পরিষদ কংগ্রেসের ছয়টি ( তন্মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর একটি প্রতিনিধি থাকতে হবে ), মুসলিম লীগের পাঁচটি, ও পার্শী, ভারতীয় খৃষ্টান ও শিখ সম্প্রদায়ের এক একটি করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে। সমস্ত দপ্তরই, এমন কি দেশরক্ষা বিভাগের দপ্তর পর্য্যন্ত এঁদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে ও প্রধান সেনাপতি এই সদস্যের নির্দ্দেশ অনুযায়ীই কাজ করবেন। ব্রিটিশ সৈন্যের ভার, ভারতীয় নৃপতি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ওপর রাজপ্রতিনিধির যা কিছু কর্ত্তৃত্ব ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী এখনও বর্ত্তমান আছে, তা অবিশ্যি রাজপ্রতিনিধির হাতেই

থেকে যাবে। পরবর্ত্তী কালের শাসন পদ্ধতি পরিকল্পনার জন্য তারা নির্দ্দেশ দিলেন যে ভারত শাসনের জন্য একটি কন্‌ফেডারেশন প্রয়োজন ও তা গঠন হবে তিনটী ইউনিয়ন নিয়ে। প্রথম ইউনিয়নে থাকবে বোম্বে, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশ, দ্বিতীয় ইউনিয়নে বাংলা ও আসাম ও তৃতীয়ে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। যে কোন প্রদেশের অবিশিষ্ট ইউনিয়ন হতে বাইরে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার থাকবে। ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতির পরিকল্পনা করবে এক গণপরিষদ, যা বর্ত্তমানের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ সমূহ সাম্প্রদায়িক হিসাবে নির্ব্বাচন করবে যাতে প্রত্যেক দশ লক্ষ লোক সংখ্যার একজন প্রতিনিধি আসতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রেখে। গণপরিষদ প্রতি ইউনিয়নের শাসন পদ্ধতি পরিকল্পনার সময় পূর্ব্বোক্ত ভাবে আলাদা আলাদা বিভাগে বস্‌বে ও ভোটের সংখ্যাধিক্যেই সমস্ত সমস্যাব মীমাংসা হবে। ইউনিয়নকে কি ক্ষমতা দেওয়া হবে তা প্রদেশরাই ঠিক করবে কিন্তু কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের ক্ষমতা থাকবে একমাত্র দেশরক্ষা, যানবাহন চলাচল ও সেই সব অর্থ-নীতির ওপর যা কেন্দ্রীয় কন্‌ফেডারেশনের জন্য প্রয়োজনীয়। নৃপতিবৃন্দ একটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করবেন ও কি সূত্রে তাঁরা গণপরিষদে আসবেন তা আলাপ আলোচনায় ঠিক করা হবে। এই গণপরিষদের সম্মিলিত চেষ্টায় যে শাসন পদ্ধতির পরিকল্পনা হবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাই মেনে নেবে ও সেই সর্ত্তে সন্ধি সংস্থাপন করে ভারতের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিবে।

মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবের সমস্তটাতেই স্বীকৃতি জানাল কিন্তু কংগ্রেস প্রথমে রাজ প্রতিনিধির সদস্য নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট হতে না পেরে সাময়িক গভর্ণমেণ্টে যোগ দিতে অস্বীকৃত হলেও ভারত শাসন সংস্কার সম্বন্ধে মিশনের ভবিষ্যৎ প্রস্তাবে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করল। কংগ্রেসকে বাদ

দিয়ে ব্রিটিশ সরকার সামরিক শাসন পরিষদ গঠন করতে প্রস্তুত হল না; তাতে মুসলিম লীগের ভেতর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ও তারা পুনরায় আলোচনা করে মিশনের উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করল। কিছু দিন পরে লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে শাসন পরিষদ সংগঠনের ভার দিল। মুসলিম লীগ এ পরিষদে যোগ দিতে অসম্মত হয়। কংগ্রেস শিখ, পার্শী, ভারতীয় খৃষ্টান ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানের প্রতিনিধি নিয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে যোগ দেওয়া মনস্থ করল। ইতিমধ্যে এল ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যা ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কলকাতা, নোয়াখালী, বোম্বে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে। এই সব গোলযোগের ভেতরই কংগ্রেস যেদিন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে সেদিন বেতার যোগে বড়লাট বাহাদুর জানান যে মুসলিম লীগের ভারত সরকারে যোগদানের পথ চিরদিনই মুক্ত থাকবে। শেষ পর্য্যন্ত মুসলিম লীগ আর বাইরে থাক সমীচীন মনে করল না, ওয়াভেলের সহযোগিতায় তারা ১১ই অক্টোবর পরিষদে প্রবেশ করল। সেই হতে সেখানে এই কথা প্রতিষ্ঠিত করতে যত্নবান যে তাঁরা ভারত সরকারের কার্য্যকরী সভার সদস্যমাত্র, মন্ত্রীমণ্ডলী নন, ও তাঁদের ভেতর যুক্ত দায়িত্বের কোন স্থান নেই। ইতিমধ্যে গণপরিষদের বৈঠক আরম্ভ হয় ও মুসলিম লীগ ব্যতীত ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ই তাতে যোগদান করে। গণপরিষদের বৈঠকের ঠিক পূর্ব্বাহ্নে ব্রিটিশ প্রাধান মন্ত্রী নেহরু, জিন্না ও লিয়াকৎআলীকে লর্ড ওয়াভেল সহ লণ্ডনে বিমান যোগে আহ্বান করে নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই মর্ম্মে ঘোষণা করেন যে গণপরিষদে সমস্ত সম্প্রদায়ের যোগদান বাঞ্ছনীয় কিন্তু যদি কোন সম্প্রদায় তাতে আদৌ না যোগ দেয় তবে সে পরিষদ যে শাসন পদ্ধতির পরিকল্পনা করবে অসহযোগী

সম্প্রদায়ের ওপর তা চাপানর জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কখনই তা পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করবে না। কংগ্রেস অবিশ্যি তাতে দমলনা, তারা গণপরিষদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল, তাদের তখনও আশা ছিল যে মুসলিম লীগ তাদের ভ্রান্তি সংশোধন করে গণপরিষদে যোগ দেবে। ইতিমধ্যে এল প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলির ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা, যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের ভেতর তার শাসন ভার ভারত থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে যাবে। ভারত পরিত্যাগের সময় সে শাসন-ভার কার হাতে দিয়ে যাবে তা বলা এখন সম্ভব নয়। সর্ব্বজনসম্মত কোন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট থাকলে তার হাতে ও দিতে পারে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ত্তমান প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে ও তারা সেই প্রদেশের শাসনভার স্বতন্ত্রভাবে দিয়ে যেতে পারে। লর্ড ওয়াভেল অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ করবেন ও তাঁর স্থলে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন ভারতের শেষ রাজপ্রতিনিধি হিসাবে ভারতে আসবেন।

এই ঘোষণার প্রথম প্রতিক্রিয়া এল পাঞ্জাবে, কোয়ালিসন গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীর পদত্যাগে। ফলে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ঘটল। এখন শোনা যায় যে এর পিছনে ছিলেন পাঞ্জাবের ইংরাজ গভর্ণর। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে আজ সেখানে যে বীভৎস ধ্বংসলীলা সংঘটিত হচ্ছে তা বাংলা বিহারের পুনারাবৃত্তি মাত্র। আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাস যাদের জানা আছে তাঁরা ভারতক্ষেত্রে তার হুবহু পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন ও বুঝতে পারবেন যে ইংরাজের কূটনীতি নতুন পদ্ধতি জানে না, তাদের একমাত্র অস্ত্র দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতর গোপনে ও কৌশলে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে নিজের সত্ব যতদিন সম্ভব কায়েমী রাখা। ভারতের বর্ত্তমান আত্মবিচ্ছেদের এই নগ্ন ও নিষ্ঠুর রূপ যে কার তৈরী তা সবাই জেনেও যে এর থেকে পরিত্রাণের

পথ খুঁজে পাচ্ছে না, জাতীয় জীবনে এই সব চেয়ে বড় কলঙ্ক। আজ মনে হয় গুরুদেবের সেই ভবিষ্যৎবাণী, সেই নিদারুণ আক্ষেপ।

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা এতদিন ইংরাজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।...

আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয় যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যদা ফিরে পাবার পথে"

মাউণ্টব্যাটেন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে পরস্পরের কোন একটা আপোষের ভেতর দিয়ে ভারতীয়দের হাতে শাসনভার অর্পণ করা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আরম্ভ করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পরামর্শানুযায়ী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৬ই মের কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা এক প্রকার বাতিল করে দেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের ঘোষণায় (যা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখেরা স্বীকার করে নিয়েছে) পাকিস্থান স্বীকৃত হল ও অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দূরীভূত হল। যে সব স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে পাকিস্থান সংস্থাপিত হতে পারবে যদি তথাকার ব্যবস্থাপক

সভার গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য ও কোন কোন ক্ষেত্রে, যথা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও শ্রীহট্টে, দেশের সাধারণ ভোটারের গরিষ্ঠ সংখ্যা তা চায়। যতদূর দেখা যায় এর ফলে বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব বিভক্ত হবে ও তথাকার মুসলিম প্রধান স্থানগুলি ও সিন্ধু প্রদেশ এই নয়া পাকিস্থান রাজ্যভুক্ত হবে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও এই দলভুক্ত হবে মুসলিম লীগ এরূপ আশা করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শাসনভার ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করবে ও দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হলে তাদের উভয়কেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন দান করবে। এ পরিকল্পনার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন, ইংরেজ তার এতদিনের অভিসন্ধি আজ ভারতবাসীকে দিয়েই সফল করিয়ে নিল সাধারণের চক্ষে একমাত্র সে কথাটাই আজ জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।

* * * * *

[ যুদ্ধান্তে পৃথিবীর শান্তি ও স্বাধীনতা : আফ্রিকার স্বাধীনতা অভিযানের পূর্ণ রূপ ]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে জগতে সত্যিকারের শান্তি ও স্বাধীনতা এসেছে কিনা, এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে জাগে। নাৎসী নেতাদের শোচনীয় পরিণামে জগৎবাসী দুঃখিত হয়নি, কিন্তু সভ্যনামধারী মানব আদর্শের যে নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ আমরা আনবিক বোমার নৃশংস হত্যালীলার ভেতর দেখলাম তার কি কোন তুলনা আছে? এর জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার আজও হয়নি কারণ এযুদ্ধে তারা বিজয়ী। আজ স্পেনের, মালয়ের, ইন্দোচীনের, ইন্দোনিশিয়ার, ব্রহ্মদেশের, প্যালেষ্টাইনের, মিশরের, আরবের, দক্ষিণ আফ্রিকার, ফিলিপাইনের ও

সর্ব্বপোরি ভারতের স্বাধীনতার দাবী তাদের নিজেদেরই মেটাতে হবে, এদের জনগণের কল্যাণে মিত্রশক্তির কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জগতে চির শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন করবে এ আশ্বাস দিতে ভোলেনি। কিন্তু কোন ভিত্তির ওপর এ শান্তি ও নিরাপত্তা গড়ে উঠ্‌বে তা আমাদের অজানা। বহিশত্রু উৎখাৎ হলেই শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। গৃহশত্রুই মানব সভ্যতার সব চেয়ে বড় শত্রু। হিটলার আজ নেই, কিন্তু মিত্রশক্তির ঘরে ঘরে আজও কি তার খোঁজ পাওয়া যাবে না? নইলে কেনই বা এত রক্ত-পাত, কেনই বা জনগণের স্বাধীনতার পথে আজও এত বাধা, এমন বিপর্য্যয়?

দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা ও আনুষঙ্গিক সকল বীভৎ-সতার সঙ্গে মুখোমুখী বাস করে, রণশ্রান্ত নরনারীর ফাঁকা আদর্শের বুলি শোনবার মত মেজাজ আর নাই। জয়লাভের জন্য উন্মাদনা প্রাণে সতত জাগরূক রাখবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত জগৎ আজ ছ বছর ধরে শুনে আসছে "উৎপীড়ককে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, পরস্বাপহারীকে নির্ম্মমভাবে দমন করতে হবে, স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, কোন জাতির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজ সহ্য করবে না"। যুদ্ধরত মিত্রশক্তির প্রচার বিভাগ বহু প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে চক্রশক্তির বিরুদ্ধে জনমত উত্তেজিত করবার জন্য যে সব বাণী শতমুখে ঘোষণা করে এসেছে, সে সব কথাই আজ যুদ্ধ অন্তে, অপেক্ষাকৃত শান্ত আবহাওয়ায়, মিত্রশক্তির পদানত দেশসমূহ যে তারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না, সে কথা কি যুদ্ধোন্মত্ত মিত্রশক্তি সেদিন ভেবেছিল? কিন্তু মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ যে, যে পরোপকারী জাতি সমগ্র মানব সমাজকে এত বড় একটা সর্ব্বনাশের হাত থেকে

উদ্ধার করল, এমন মহা অসুরের দমন, যার ত্যাগে ও বীরত্বে সম্ভব হল—তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই অভিযান চালাতে চায়!

স্বাধীনতার ভেরী আজ বেজে উঠেছে দিকে দিকে। যে মুখের কথা, যে আদর্শ সামনে তুলে ধরে মিত্রশক্তি জনগণকে রক্তদানে উত্তেজিত করেছে, সে আদর্শ, আজকে যুদ্ধোত্তর কালের নিপীড়িত, বিধ্বস্ত মানব কাজে পরিণত দেখতে কৃতসংকল্প। কেবল মুখের কথায় আজ আর কেউ সন্তুষ্ট হতে পারে না—বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত যে প্রচণ্ড শক্তিকে আজ নাড়া দিয়ে তোলা হয়েছে, আত্মোপলব্ধির দরজায় যে আজ পৌঁচেছে, সে আজ আর প্রভুর আদেশে শান্ত হয়ে আগের জায়গায় ফিরে যাবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে পৃথিবী দেখেছে রণক্লান্ত বিজয়ী বীরের ঘরে ফেবার পর তার সত্যকার পরাজয়—যে বরমাল্য, যে গৌরব ও প্রশংসা যুদ্ধকালে তাকে মাতিয়ে রেখেছে, তার উৎসাহের অনল প্রজ্জ্বলিত রেখেছে, যুদ্ধ অন্তে তার কোন চিহ্ন ও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যুদ্ধোত্তর ভাগ বাঁটোয়ারা, কাড়াকাড়ির মধ্যে সাধারণ সৈনিকের কথা কারো মনে পড়েনি—আজকে যুদ্ধ অন্তে সাধারণ জনসমাজ সে অবহেলা মেনে নিতে রাজী নয়। যুদ্ধকালীন সকল প্রতিজ্ঞা অক্ষবে অক্ষরে পালন করতে হবে, এই তাদের দাবী।

আজকের দিনের স্বাধীনতার অভিযানের সামনে কোন উৎপীড়নই টিঁকবে না—আজকের অভিযান বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে অধীণ জাতির অভিযান, ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের অভিযান, জমির মালিকের বিরুদ্ধে কৃষকের অভিযান, অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের অভিযান, হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার অভিযান, বাহুল্যের বিরুদ্ধে দারিদ্রের অভিযান, ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে মহত্বের অভিযান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের অভিযান, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের অভিযান, মৃত্যুর বিরুদ্ধে অমৃতের অভিযান।

সমগ্র পৃথিবী আজ অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে—পৃথিবীর সকল দেশের অত্যাচারিত, নিপীড়িত আজ ন্যায় বিচার চায়—চুপ করে মুখ বুঁজে শতকরা নিরানব্বই জন এতদিন নীরবে একজনের আদেশ সয়ে এসেছে; তার ইচ্ছায়, তার অঙ্গুলি হেলনে নিজের বুকের রক্ত দিয়েছে, নিজের শুভাশুভ চিন্তা করেনি, তারই প্রাণমাতান মিথ্যা কথায় ভুলে এসেছে। আজ দিন এসেছে মিথ্যা আবরণ ছিঁড়ে ফেলবার—মিথ্যা জারিজুরী আর চল্‌বে না।

আজকের যে স্বাধীনতার অভিযান তা শুধু বিদেশীর হাত থেকে মুক্তির অভিযান নয়, এ যুগের দাবী বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা, জগতের মাঝে মানুষের মত বেঁচে থাকবার—আজ বিশ্বের মানব সমাজ দাবী জানাচ্ছে উপযুক্ত খোরাকের দেহের ও মনের। কবির ভাষায় বল্‌তে গেলে তাদের দাবী—

> "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
> সাহস বিস্তৃত বক্ষপট"

শিক্ষা চাই, সংস্কৃতি চাই, নিজেকে উন্নত করবার সুযোগ চাই,—অমূল্য মানব জীবন, এর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের ক্ষেত্র চাই—আজকে স্বাধীনতার দাবী বলতে বোঝায় এই।

স্বাধীনতার অভিযানে মানুষ কি এগিয়ে চল্‌বে অতিমানবতার দিকে, মহামানবতার দিকে, দেবত্বের দিকে? না মানুষ পাশবিক শক্তিতে শক্তিশালী হতে হতে আপনারই শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে তলিয়ে যাবে অতলস্পর্শী গহ্বরে? আজ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের সন্ধিক্ষণে আজকের যুগের পথপ্রদর্শকদের হাতে ভার, মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে

যাবার—হয় অনন্ত আলোকের নয় অসীম অন্ধকারের পথে—আজকের যুগের মানুষ কোন পথে চলেছে? কোথায় এর পরিণতি? ভবিষ্যৎ এর উত্তর দেবে।

—)০ঃ০(—

# পরিশিষ্ট

ভারত স্বাধীনতা অভিযানে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা

১৮৫৭-৫৮— সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৮—মহারাণীর ঘোষণা—কোম্পানী শাসনের অবসান ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারতের শাসন ভার গ্রহণ

১৮৭৫—মুসলিমদের ভেতর ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন আকাঙ্খায় আলীগড়ে এংলো ওরিয়েন্টেল কলেজ স্থাপন।

১৮৭৬—কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠা

১৮৮৩—ইলবার্ট বিল ভারতে অবস্থিত ইংলণ্ড বাসীর বিরোধিতায় বাতিল—সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক ন্যাসানেল ফাণ্ড গঠন—জাতীয়তা সংগঠন মানসে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন।

১৮৮৫— বোম্বাইতে ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশানাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন

১৮৯৭—হিংস নীতির প্রথম প্রকাশ—২২শে জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়া শাসনের হীরক জয়ন্তী উৎসব দিনে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে

পুণায় র‍্যাণ্ড ও এয়াষ্টে'র মৃত্যু—ষড়যন্ত্রের অভিযোগে লোকমান্য তিলকের প্রথম কারাদণ্ড।

১৯০৫—কংগ্রেসে চরম পন্থার উদ্ভব—ও কংগ্রেসের যুবরাজের ( Prince of Wales ) অভ্যর্থনা প্রস্তাবে চরম পন্থীর বিরোধিতা—বঙ্গবিচ্ছেদ—স্বদেশী আন্দোলন।

১৯০৬—বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্সে পুলিশের লাঠি চার্জ্জ—সুরেন্দ্র নাথের গ্রেপ্তার ও জরিমানা—কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে জাতীয় মহাসভা ও তৎসহ প্রথম স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী—আগার্খার অধিনায়কত্বে মুসলিম লীগের পত্তন।

১৯০৭—লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংহের নির্ব্বাসন দণ্ড—সুরাট কংগ্রেসে নরম চরম পন্থীর সংঘর্ষ—ইণ্ডিয়ান হোমরুল পার্টি-গঠন—বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টায় অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, বান্ধব সমিতি, প্রভৃতির গঠন—লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রের চাঞ্চল্য—মদন লাল ধিংরার গুলিতে কার্জ্জন উইলির প্রাণহানি—সভরকারের গ্রেপ্তার—বিচারার্থে ভারতে প্রেরণ—পথিমধ্যে জাহাজ হতে সমুদ্রে লম্ফন ও সন্তরণ যোগে ফরাসী উপকূলে পলায়ন ফরাসী কর্তৃক পুনঃ গ্রেপ্তার ও আন্তর্জাতিক নীতি লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রিটিশ হস্তে সমর্পণ।

১৯০৮—বাংলায় হিংস নীতির প্রকাশ—৩০শে এপ্রিল মুজাফরপুরে ভুলক্রমে মিসেস্ ও মিস্ কেনেডীর উপর ক্ষুদি রামের বোমা নিক্ষেপ—সরকারের হাত এড়াতে প্রফুল্ল চাকির আত্মবিনাশ—ষড়যন্ত্র অপরাধে শ্রী অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপধ্যায়, বারীণ ঘোষ, উল্লাস কর দত্ত প্রমুখ দেশ সেবীর বিচার—আলীপুর জেলে

কানাই লালের গুলির আঘাতে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই এর মৃত্যু—লোকমান্য তিলকের ছয় বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড—বিচারালয়ের সম্মানহানির অভিযোগে বিপিন পালের কারাদণ্ড।

১৯০৯—মর্লি মিণ্টো শাসন সংস্কার—ভাবতীয় হিসাবে সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহকে ভারত গভর্ণমেণ্টে ও কিশোরীলাল গোস্বামীকে বাংলা গভর্ণমেণ্টে প্রথম সদস্য পদ দান—সংবাদ পত্র অ্যাক্ট।

১৯১০—প্রেস অ্যাক্ট ব্যাপারে মতদ্বৈধতায় দরুণ শ্রীযুত সিংহের পদত্যাগ

১৯১১—দিল্লী দরবার—বঙ্গবিচ্ছেদ রদ।

১৯১২—ভাবত রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী অপসারণ—বিপ্লবী রাসবিহারী বোস কর্তৃক লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ—রাসবিহারীর বিদেশ পলায়ন

১৯১৩—ক্যালিফরনিয়ায় ভারতেব বিপ্লব সাহায্যার্থে 'গদর' পার্টি গঠন ও হরদযালের সম্পদনায় 'হিন্দুস্থান গদর' পত্রিকার প্রারম্ভ।

১৯১৪—বিপ্লবীসহ 'কামাগাটামারু' জাহাজের বজ্ বজে আগমন ও আরোহীদের সরকারী বাধা সত্ত্বে কলিকাতা আগমনের প্রচে-ষ্টায় খণ্ডযুদ্ধ, দলের নায়ক গুরদিৎ সিংহের পলায়ন—মালয়ে ও সায়ামে গদর পার্টির সাফল্য—পার্টির অন্যতম নেতা হবনাম সিং ও মোহন লালের সায়ামে গ্রেপ্তার ও ব্রহ্মদেশে আনয়ন ও ব্রিটিশ বিচারে প্রাণদণ্ড—ক্যালিফরনিয়ায় হবদয়ালের গ্রেপ্তার—হরদয়ালের সুইজারল্যাণ্ড পলায়ন—বার্লিনে ভূপেন দত্ত ও ধীরেন চট্টোপধ্যায় কর্তৃক ভারত স্বাধীনতা অর্জনে বিপ্লবী দলের সৃষ্টি

১৯১৫—ভারতব্যাপী সৈন্য বিদ্রোহের পরিকল্পনা—কৃপাল সিং ও নবাব খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজের পূর্বাহ্নে সাবধানতা ও

বিদ্রোহের অঙ্কুরে বিনাশ—বালাসোরে বিপ্লবী যতীন মুখার্জি ও চিত্তপ্রিয়ের ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রাণদান—

১৯১৬—অ্যানি বেসান্ট কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান্ হোমরুল লীগ গঠন—কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগের লক্ষ্ণৌ চুক্তি

১৯১৬—কংগ্রেসে চরম পন্থীর পুনঃ প্রবেশ—ভারত সচীব মণ্টেগুর ঘোষণা ( ২০ শে আগষ্ট )

১৯১৮—মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট ও দ্বৈত শাসন ( Dyarchy ) পরিকল্পনা—মডারেট দলের কংগ্রেস পরিত্যাগ ও ইণ্ডিয়ান্ ন্যাসান্যাল লিবারেল ফেডারেশন গঠন—মান্দ্রাজে সর্ব্বপ্রথম শ্রমিক সংঘ গঠন

১৯১৯—রাউলাট অ্যাক্ট—ভারতব্যাপী বিক্ষোভ—পাঞ্জাবে গণ-আন্দোলন ও সমর আইন—জালিওয়ানাবাগে নরবলি—পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্র নাথের "নাইট" উপাধি ও শঙ্কর নায়ারের ভারত সরকারের সদস্যপদ ত্যাগ—জার্ম্মানীতে ভারত বিপ্লব সাহায্যার্থে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ প্রমুখ ভারতীয়ের উদ্যোগে 'হিন্দি' সভার উৎপত্তি

১৯২০ অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্ভব -নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের পত্তন—আলীগড়ে মুস্‌লিম বিশ্ববিদ্যালযের প্রতিষ্ঠা

১৯২১ - মোপলা বিদ্রোহ

১৯২২—মহম্মদ আলি জিন্নার কংগ্রেস পরিত্যাগ

১৯২৮—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের "স্বরাজ্য" পার্টি গঠন—বাংলায় হিংস নীতির পুনরুৎপত্তি

১৯২৪—"স্বরাজ্য" পার্টির ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ—সন্দেহের ওপর

বিনাবিচারে কারাদণ্ডেব অর্ডিন্যান্স—কলিকাতা কর্পরেশনের প্রধান কর্ম্মচাবী সুভাষচন্দ্রের বিনাবিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাদণ্ড ও মান্দালয় কারাগারে প্রেরণ—বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক বিপ্লববাদী হিংসনীতি অবলম্বী যুবকদের কার্য্যাবলীর সমর্থনে অপারগতা সত্ত্বেও তাদের দেশপ্রীতি ও আত্মত্যাগের জন্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

১৯২৫—অল্ ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড্ ক্লাস এসোশিয়েশনের উৎপত্তি

১৯২৬—সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের উদ্ভব—আর্য্যসমাজেব নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দেব মুসলমান আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু

১৯২৭—সাইমন কমিশনেব নিযুক্তি—ভাবতব্যাপী বিক্ষোভ—কংগ্রেসেব পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব—কংগ্রেসের অভ্যন্তবে ইন্ডিপেনডেন্স লীগের সৃষ্টি

১৯২৮—অল্ পার্টিস কন্ভেন্সন্—নেহরু রিপোর্ট—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে কংগ্রেসেব প্রস্তাব—চট্টগ্রামে সূর্য্যসেনের নায়কত্বে বিপ্লবী দল কর্তৃক সবকাবী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী সহর অধিকার

১৯২৯—লর্ড আরুইনেব ঘোষণা ( ৩১ শে অক্টোবর )—মীরাটে ষড়যন্ত্র অভিযোগে কম্যুনিষ্টদের চারি বৎসর ব্যাপী বিচারের প্রারম্ভ।

১৯৩০—আইন অমান্য আন্দোলন—প্রথম গোল টেবিল বৈঠক

১৯৩১—গান্ধী আরুইন চুক্তি—দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক

১৯৩২—সরকারী অত্যাচারে কংগ্রেসের দমন—তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ( Communal Award ) —পুণা চুক্তি

১৯৩৩—হোয়াইট পেপার বিজ্ঞপ্তি

১৯৩৩—আইন অমান্য আন্দোলন উত্তোলন—ভারত শাসন সংস্কার সম্বন্ধে যুক্ত কমিটির রিপোর্ট—মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস পরিত্যাগ

১৯৩৫—নূতন শাসন সংস্কার

১৯৩৭—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ( Provincial Autonomy )—বছরের মাঝামাঝি কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ

১৯৩৯—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ—রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের ও গান্ধীপন্থীর বিতণ্ডা—ফরওয়ার্ড ব্লক সৃষ্টি—ব্যক্তিগত আইন অমান্য

১৯৪০—লিন্‌লিথগাওয়ের ঘোষণা—সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান

১৯৪১—জার্ম্মানীর রুশিয়া আক্রমণে ও জাপানের ইংরাজ ও আমিরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় ভারতের প্রতিক্রিয়া—বার্লিন হইতে বেতার যোগে সুভাষচন্দ্রের ভারতবাসীকে সম্ভাষণ—ভারত স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় ইউরোপে জাতীয় সেনা গঠন

১৯৪২—ক্রীপ্‌সের ভারত আগমন—ক্রীপস্ প্রস্তাব ও রাজনৈতিক দলের প্রত্যাহার—পূর্ব্ব এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ডিপেনডেন্স লীগের পত্তন ও আজাদ্ হিন্দ ফৌজ গঠন—মহাত্মা গান্ধীর ইংরাজের ভারত ত্যাগের দাবী—বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত—মহাত্মা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কারাদণ্ড—জাতীয় বিদ্রোহ ও ইংরাজের নৃশংসতা

১৯৪৩—বাংলার মন্বন্তর—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্ব্ব এশিয়ায় আগমন ও আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ—ঝাঁসী রাণী বাহিনী গঠন—আজাদ্ হিন্দ্ সাময়িক শাসন প্রতিষ্ঠান ( ২১শে অক্টোবর ) আজাদ্ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আইনতঃ শাসন ভার গ্রহণ

১৯৪৪—আজাদ্ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের ইংরাজ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা—কোহিমা অধিকার—ইম্ফাল রণপ্রাঙ্গন

১৯৪৫—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তি–সিমলা কন্‌ফারেন্স—দিল্লী দুর্গে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সামরিক বিচার—ভারতব্যাপী বিপ্লবের সূচনা

১৯৪৬—সৈন্য ও নৌবাহিনীর বিক্ষোভ—সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাফল্য—পার্লামেণ্ট ডেলিগেশন ও কেবিনেট মিশনের ভারত আগমন --সাময়িক অন্তবর্ত্তী ভারত গভর্ণমেণ্ট—গণপরিষদ

১৯৪৭—অ্যাটলির ভারত ত্যাগের ঘোষণা ( ২০শে ফেব্রুয়ারী )– ৩রা জুনের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা ।